মহাত্মা

কেশব চন্দ্র সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

শ্রীজগদ্বন্ধু মৈত্র প্রণীত।

কলিকাতা।

১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৩।

মূল্য ।০ চারি আনা

ভূমিকা।

ভারতভূমি রত্ন প্রসূ। ইনি অসংখ্য রত্ন গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। কহিনুর, কৌস্তভ প্রভৃতি মহামূল্য রত্ন সকল একদিকে যেমন ইহাঁর গর্ভে উৎপন্ন হইয়া, জন সমাজে ইহাঁকে ঐশ্বর্য্যশালিনী রূপে পরিচিত করিয়াছে, অন্যদিকে আবার সেইরূপ, বাল্মীকি, ব্যাস, কালীদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণ কপিল, গৌতম, কণাদ প্রভৃতি দার্শনিকগণ মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রণেতৃগণ, আর্য্যভট্ট বরাহ মিহির প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদগণ, নারদ, শুকদেব, বুদ্ধদেব, প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রাণ সাধুমহাত্মাগণ, ইহাঁর উদরে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইহাঁকে সভ্য জগতের শীর্ষস্থানীয় করিয়া তুলিয়াছে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যা প্রভৃতির ন্যায় আদর্শ রমণী জগতে অতি অল্পই পাওয়া যায়। মহাবীর্য্যবান সুধন্বী লক্ষ্মণ, অতুল পরাক্রমশালী মহাবীর ভীষ্ম, প্রবল প্রতাপ মহাবল কর্ণ, অরাতি নিসূদন পরন্তপ পার্থ প্রভৃতি বীরগণের তুল্য বীর জগতের ইতিহাসে কয়জন দৃষ্টি গোচর হয়? এ ত গেল ভারতের সৌভাগ্যময় সময়ের

কথা। ভারত যখন স্বাধীন, ভারত যখন জ্ঞানে ধর্ম্মে সভ্যতায় বাহুবলে জগতে অতুলনীয়, এ ত গেল সেই শুভ দিনের কথা। সে সময়ে—সেই গৌরবময় সময়ে সকলই সম্ভবে। ইহার পরবর্ত্তী সময়ে অবরোহণ কর, যে সময়ে ভারতের স্বাধীনতা সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে, জ্ঞান গরিমা অন্তর্হৃত হইয়াছে ও সৌভাগ্য-শশী ঘোর দুর্ভাগ্য রাহুর কবলগত হইয়াছে, সেই সময়ের প্রতি, সেই অধঃপতনের সময়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিবে রত্ন প্রসূতি তখনও রত্ন প্রসব করিতেছেন। তখনও তাঁহার খনিতে এমন সকল অত্যুজ্জ্বল অমূল্য রত্ন সকল উৎপন্ন হইতেছে, যাহা অবলোকন করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞানে সমুন্নত, সভ্যতা রশ্মিতে উদ্ভাসিত, স্বাধীনতালোকে আলোকিত সুসভ্য দেশ সকলও, বিস্মিত, স্তম্ভিত ও মোহিত হইয়া যাইতেছে। প্রাতঃস্মরণীয় বীর শ্রেষ্ঠ রাণা প্রতাপ সিংহের ন্যায় স্বদেশ প্রেমিক জগতে সুলভ নহে। পদ্মিনীর ন্যায় সতী রমণীও জগতে অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। নানক, কবির, চৈতন্য, রামমোহন রায় প্রভৃতি ধর্ম্মাত্মা সাধুগণের ন্যায় ক্ষণজন্মা পুরুষও পৃথিবীতে অধিক মিলে না, ইহাঁরা এক একটী মহারত্ন, ভারত মাতার অমূল্য অঙ্ক ভূষণ। মহাত্মা কেশবচন্দ্রও তাহার অন্যতম। এই সকল রত্নের মধ্যে একটী উজ্জ্বল মহামূল্য রত্ন।

কেশব বাবু জগৎকে—বিশেষতঃ স্বজাতিকে যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহা অমূল্য। পৃথিবী তাঁহার নিকট যে শিক্ষা লাভ করিয়াছে, জগতে তিনি যে সকল মহাসত্য প্রচার ও জীবনে পরিণত করিয়া গিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

কোন ধর্ম্ম-পুস্তক অভ্রান্ত আপ্ত বাক্য নহে, ভ্রম প্রমাদ শালী মনুষ্য বিরচিত; সুতরাং সত্য অসত্য সংমিশ্রিত। ধর্ম্মের মূল ভিত্তি কোন শাস্ত্র নামধারী পুস্তক বিশেষ নহে, কিন্তু আত্ম প্রত্যয় সিদ্ধ সহজজ্ঞান; মহাত্মা কেশব চন্দ্রের এই একটী মহাশিক্ষা। হিন্দু, মুসলমান য়িহুদি, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্ম কোন না কোন গ্রন্থরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদ, হিন্দু ধর্ম্মের, বাইবেল য়িহুদি ও খৃষ্টান ধর্ম্মের এবং কোরাণ মুসমান ধর্ম্মের ভিত্তি। এই সকল ধর্ম্মাবলম্বীগণ তাঁহাদিগের স্ব স্ব ধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ ধর্ম্ম গ্রন্থ সকলে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তাহাকেই ধর্ম্ম ও তৎভিন্ন আর সকলকে অধর্ম্ম মনে করেন। এই সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা মানিয়া চলিলেই ধার্ম্মিক, তদন্যথায় অধার্ম্মিক। মহাত্মা কপিল এই ধর্ম্ম মতের বলে ঈশ্বর না মানিয়াও কেবল হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি বেদকে অভ্রান্ত আপ্ত বাক্য বলিয়া স্বীকার করাতে আস্তিক।

আর মহামুণী পরম যোগী শাক্য সিংহ ঈশ্বর মানিয়াও কেবল বেদকে অমান্য করাতেই নাস্তিক নামে অভিহিত। এই সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্র আবার অভ্রান্ত ঈশ্বর বাণী। হিন্দুর বেদ মানবের বাগযন্ত্র হইতে বহির্গত হয় নাই। ইহা অপৌরুষের আপ্তবাক্য, ভগবানের উক্তি। এইরূপ মুসলমানের কোরাণ, খৃষ্টানের বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্ম-গ্রন্থ সকল ভগবদুক্ত অপৌরুষের আপ্তবাক্য রূপে পরিগৃহীত। এই সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্র যদি অপৌরুষের আপ্তবাক্য হয়, ভগবানের উক্তি হয়, তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে এত মত পার্থক্য কেন? এত বিরোধ কেন? বেদ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতিতে এত প্রভেদ কেন? ঈশ্বর ত এক। সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রই ত, জগতের সৃষ্টি স্থিতি পালন কর্ত্তা, মানবের ধর্ম্ম জীবনের নেতা ও উপদেষ্টা এক বলিয়া মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে। তবে তাঁহার প্রণীত ধর্ম্ম-শাস্ত্রে এত মত পার্থক্য কেন, এত বিভিন্নতা কেন, পরস্পর এত বিরোধ ভাব কেন? তিনি কি দেশ ভেদে, কাল ভেদে, জাতি ভেদে বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তিনি কি হিন্দুর পক্ষে যাহা ধর্ম্ম, মুসলমানের পক্ষে তাহা ধর্ম্ম নহে বরং অধর্ম্ম, খৃষ্টানের পক্ষে যাহা ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পক্ষে ধর্ম্ম নহে, প্রত্যুত পাপ কার্য্য, এই প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কদাচ নহে। প্রভু পরমেশ্বর যেমন

এক ও অদ্বিতীয়, তাঁহার ধর্ম্মও সেইরূপ এক ও অদ্বিতীয়। জাতি কাল ও দেশ ভেদে তাহার কোন প্রকার প্রভেদ হয় না, ইতর বিশেষ হইতে পারে না। আর এক কথা, ধর্ম্ম-শাস্ত্র সমূহে অনেক ভ্রম প্রমাদ, অনেক অসত্য দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ণ সর্ব্বজ্ঞ অনন্ত জ্ঞানবান পুরুষ প্রণীত শাস্ত্রে ভ্রম, কুসংস্কার, অসত্য প্রভৃতি স্থানলাভ একান্ত অসম্ভব। বাস্তবিক সেই অনন্ত জ্ঞানের আকর, সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণপুরুষ এই সকল শাস্ত্রের প্রণেতা নহেন। এই সকল ভ্রম প্রমাদ পূর্ণ, অসত্য সংমিশ্রিত, পরস্পর বিভিন্ন মত বিশিষ্ট ধর্ম্ম-গ্রন্থ সমূহ, তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন হয় নাই। ভ্রম প্রমাদ যুক্ত অপূর্ণ মানব ইহার প্রণেতা। সুতরাং ইহা এত ভ্রম প্রমাদপূর্ণ। এত পরস্পর বিভিন্ন প্রকারের মত সমূহে পরিপূর্ণ।

আর এক কথা,কেহ কেহ হয়তঃ, হয়তঃ কেন নিশ্চয়ই বলিবেন যে সমস্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্র ঈশ্বরের প্রণীত নহে, কেবল একখানি ধর্ম্ম-শাস্ত্র তাঁহার প্রণীত। মানব জাতির ধর্ম্ম-শিক্ষার জন্য কেবল একখানি ধর্ম্ম-গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন। অন্যান্য সকল গুলি মনুষ্য প্রণীত। কিন্তু ধর্ম্ম-গ্রন্থ সকলের কোনখানি তাঁহার প্রণীত ও কোন খানি মনুষ্য বিরচিত? কোন খানি যে ঈশ্বর প্রণীত ধর্ম্ম-শাস্ত্র, কেমন করিয়া তাহা নির্দ্ধারিত হইবে? ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকলের

মধ্যে যে কোন খানি অভ্রান্ত অপৌরুষেয় আপ্তবাক্য, বেদ, বাইবেল,কোরাণ, জেন্দাবেস্তা প্রভৃতির কোন খানী যে ভগবদুক্তি তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কোন উপায় আছে কি? বাস্তবিক সম্প্রদায় বিশেষ প্রবর্ত্তিত কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্র ভগবদুক্তি বলিয়া ধরিয়া লইলেও তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই। ভগবান কাহাকেও কিছু বলিয়া দেন নাই। আর এক কথা, ঈশ্বর মানব মাত্রেরই সৃষ্টি কর্ত্তা। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলই তাঁহার সৃষ্ট। কিন্তু যদি তিনি বেদকেই শুধু ধর্ম্ম নির্ণায়ক গ্রন্থ রূপে নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীগণের দশা কি হইবে? তাহারা কি পরম মঙ্গলাকর ধর্ম্ম ধনে বঞ্চিত থাকিবে? আর যদি বাইবেল, কি কোরাণ কি জেন্দাবেস্তার অন্যতম ঈশ্বর প্রণীত হয়, তাহা হইলে সেই শাস্ত্রানুসরণকারী ভিন্ন অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক সমূহ কি চিরকাল ধর্ম্ম ধনে বঞ্চিত থাকিয়া পশুজীবন অতিবাহিত করিবে? ধর্ম্মের সাহায্যে মুক্তি রত্ন লাভ করিতে পারিবে না? পরম ন্যায়বান ও অনন্ত করুণাময় বিধাতার রাজ্যে ঈদৃশ অবিচার হওয়া একেবারে অসম্ভব। যিনি এ কথা বলেন,তিনি ঘোর নাস্তিক।

অধুনা ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সহজ জ্ঞানরূপ সুদৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিরাপদে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এক

সময়ে তাহা ছিলনা। তখন বেদ ইহার ভিত্তিভূমি ছিল। যদিও উদারভাবে সর্ব্ব জাতীয়, সর্ব্ব দেশীয়, সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-শাস্ত্র হইতে সত্য সকল গ্রহণ করিয়া ইহার অঙ্গ পুষ্টি করা হইয়াছিল, তথাপি বেদই ইহার মূল ভিত্তি ছিল। ইহার পর কিছুদিন যুক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল ভিত্তির স্থান অধিকার করে। কেশব বাবু ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার পর যুক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি ভূমির স্থান হইতে বিচ্যুত হয়। সহজজ্ঞান সেইস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদিত হয়, কিন্তু কেশব বাবু তাঁহার প্রধান সহকারী ছিলেন। মহর্ষি কেশব বাবু হইতে এ বিষয়ে প্রচুর সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এক নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করেন বটে, পৌত্তলিকতা পূর্ণ ভারত ক্ষেত্রে, বহু দেব দেবীর রাজ্যে এক নিরাকার ব্রহ্মের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করেন বটে, বহু দেবোপাসনার পরিবর্ত্তে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা প্রচার করেন বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। যাঁহারা তাঁহার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেবল সপ্তাহান্তে সমাজে গিয়া নিরাকার ঈশ্বরকে উপাসনা করিতেন মাত্র। কিন্তু তাঁহাদিগের পরিবারের মধ্যে, অনুষ্ঠানে, ইহা স্থান লাভ করিতে পারে নাই।

পৌত্তলিকতার যাবতীয় অনুষ্ঠানই তাহারা গৃহে সম্পাদন করিতেন, কেবল সপ্তাহান্তে ব্রহ্ম মন্দিরে গিয়া একবার নিরাকার ব্রহ্মকে অর্চ্চনা করিয়া আসিতেন। কেশব বাবুই একেশ্বর বাদ ব্রাহ্মধর্ম্মকে ব্রাহ্মগণের পরিবার মধ্যে, সকল প্রকার অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। ষষ্ঠী, মাকাল, সুবচনী প্রভৃতি গৃহ দেবতার স্থানে নিরাকার ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। অধুনাতন যে মতে ও অনুষ্ঠানে অনেক একেশ্বর বাদী ব্রাহ্ম পরিবার দেখিতে পাওয়া যায়, কেশব বাবুই তাহার প্রতিষ্ঠাতা।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে ঈশ্বর সম্বন্ধে এই প্রকার মত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে যে ঈশ্বর নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত, নিঃসঙ্গ ও উদাসীন। সৃষ্টির সঙ্গে তাঁহার প্রত্যক্ষ ভাবে কোন সম্পর্ক নাই। তিনি ইহা সৃষ্টি করিয়া নিয়মিত রূপে পরিচালিত হইবার জন্য কতকগুলি নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। সেই সকল নিয়ম দ্বারা ইহার যাবতীয় কার্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, সুশৃঙ্খল ভাবে চলিতেছে। কিন্তু তিনি ইহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন; নিষ্ক্রিয়। এই মত নিতান্ত ভ্রমাত্মক। ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন নহেন। সৃষ্টির সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার কোন সংস্রব নাই, বাস্তবিক তাহা ঠিক নহে। এই অনন্ত বিশ্ব যেমন সেই অনন্ত পুরুষ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেই রূপ

ইহা প্রত্যক্ষভাবে তাঁহারই দ্বারা পরিচালিত ও পরিরক্ষিত হইতেছে। ঈশ্বর যেমন ইহাকে স্বহস্তে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ তিনি স্বয়ং ইহার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া, শক্তি-রূপে, প্রাণরূপে, অবলম্বনরূপে বিদ্যমান থাকিয়া ইহার প্রত্যেক কার্য স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিতেছেন। এবং দিন দিন ইহাকে উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থার দিকে স্বয়ং লইয়া যাইতেছেন। ব্রাহ্মসমাজ বিশেষতঃ কেশব বাবুই এই মতের প্রতিষ্ঠাতা ও পূর্ব্বোক্ত ক্রমাত্মক মতের নিবারণ কারী।

ভক্তি সম্বন্ধে ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে এই প্রকার মত প্রচলিত আছে যে নিরাকার পদার্থকে ভক্তি করা যায় না। শুধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া ভক্তি সন্তুষ্ট হইতে পারে না, চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না। প্রত্যক্ষ দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পদার্থ ভিন্ন তাহার সন্তুষ্টি ও চরিতার্থতা লাভ হয় না। জ্ঞানযোগে বিশ্বাস বলে নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে, কিন্তু ভক্তি যোগে ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে হইলেই তাঁহাকে সাকার বলিয়া মানিতে হইবে। নতুবা ভক্তি কদাচ চরিতার্থ হইতে পারিবে না। এ কথা অতি ভ্রমাত্মক। ঈশ্বর যে সাকার নহেন, এ কথা সর্ব্ব বাদী সম্মত। বাস্তবিক ঈশ্বরকে সাকার রূপে ধরিয়া লইলে তাঁহার আর ঈশ্বরত্ব থাকে না। যে অনন্তত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্তা

সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণের জন্য তিনি ঈশ্বর, যদি তিনি নিরাকার না হইয়া সাকার হন, তাহা হইলে এই সকল গুণ তাঁহাতে কিছুতেই থাকিতে পারে না। সাকার হইলেই তিনি পরিমিত, পরিমিত হইলেই তাঁহার গুণরাশিও পরিমিত। তাহা হইলে তিনি অনন্ত নহেন, সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন না ও সর্ব্বজ্ঞ হওয়া অসম্ভব। তাহা হইলে সৃষ্ট জীবে আর তাঁহাতে প্রভেদ থাকিল কোথায়? তবে যদি তিনি বাস্তবিক সাকার না হইলেন, তবে সাকার কল্পনা করিয়া লাভ কি? কল্পিত পদার্থকে কি কেহ কখন বাস্তবিক ভক্তি করিতে পারে। একটী মৃত্তিকা নির্ম্মিত ব্যাঘ্রকে যদি জীবন্ত প্রকৃত ব্যাঘ্র কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে সেই কল্পিত ব্যাঘ্র হইতে কি বাস্তবিক জীবন্ত ব্যাঘ্র হইতে লোক যত ভয় পায়, তত ভয় পাইয়া থাকে? কদাচ নহে। সেই প্রকার নিরাকার ঈশ্বরকে সাকার বলিয়া কল্পনা করিলেও বাস্তবিক ভক্তির উদয় হয় না। হইতে পারে না। কেননা সে জানিতেছে যে আমার দেবতা কাল্পনিক ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই প্রকার কল্পনা দ্বারা উপকার ত কখনই হয়না, বরং মহান ঈশ্বরকে ক্ষুদ্র রূপে কল্পনা করাতে অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান পুরুষকে পরিমিত মনে করাতে নিজের মহান্ ক্ষতি হয়। ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয়। আর এক কথা,—বাস্তবিক

ঈশ্বরকে নিরাকার ভাবে ভিন্ন সাকার ভাবে কদাচ উপাসনা করা যাইতে পারে না। যাঁহারা বলেন আমরা সাকার বাদী, তাঁহারাও বাস্তবিক সাকার বাদী নহেন, কিন্তু নিরাকার বাদী। একটী দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। যাঁহাদের বাটীতে দুর্গোৎসব কি, অন্য কোন পূজা হইয়া থাকে, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে, আবাহন হইয়া থাকে, বিসর্জ্জন হইয়া থাকে। প্রাণ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে, আবাহনের পূর্ব্বে, প্রতিমা পঞ্জরকে কেহ দেবতা বলিয়া মনে করে না। তখন সেই প্রতিমা পঞ্জর অস্পৃশ্য জাতিদিগের দ্বারা পৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাতে কিছু দোষ হয় না। কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইলে, প্রতিমা পঞ্জরে দেবতার অধিষ্ঠান হইলে আর তাহা অস্পৃশ্য জাতিদিগের দ্বারা কদাচ পৃষ্ট হইতে পারে না। বিসর্জ্জনের পরও এই ব্যবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা কি জানা যায়? ইহাদ্বারা কি এই জানা যায় না যে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গোচরীভূত যে প্রতিমা পঞ্জর তাহা আর কিছুই নহে, কেবল তৃণ মৃত্তিকাদির স্তূপ মাত্র। কিন্তু উহার অভ্যন্তরে যে দেবতার আবির্ভাব হয়, তাহাই বস্তবিক উপাস্য। উপাসকেরা প্রকৃত প্রস্তাবে সেই দেবতারই উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই দেবতা কি লোক লোচনের গোচরীভূত? কেহ কখন

কি আবাহনের কি বিসর্জ্জনের সময় চর্ম্ম চক্ষু দ্বারা দেবতাকে দেখিতে সক্ষম হইয়াছেন, কদাচ নহে। দেবতাকে দর্শন করিতে পারিতেছেন না, অথচ ভক্তি করিতেছেন; শুধু বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া ভক্তি চরিতার্থ হইতেছে। তাঁহারা মুখে বলিতেছেন যে নিরাকার ঈশ্বরকে ভক্তি করা যায় না, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য দ্বারা তাঁহাদিগের কথার ভ্রমাত্মকতা প্রতিপাদিত হইতেছে। তাঁহাদের কার্য্য দ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে, সাকারভাবে ঈশ্বর উপাসনা অসম্ভব। যাহা হউক এই প্রকার বিশ্বাস বহুকাল মানব মন অধিকার করিয়াছিল। অনেক দিন হইতে এই মত প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। কেশব বাবুই এই মতের ভ্রমাত্মকতা প্রতিপাদন করেন। অনন্ত, অসীম, সর্ব্বশক্তিমান অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি পালন কর্ত্তা মহান নিরাকার ইশ্বরকে যে ভক্তি করা যায় তিনিই তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।

কেশব চন্দ্রই জাতি ভেদের প্রকৃত উচ্ছেদ কারী। মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় যদিও জাতি নির্ব্বিশেষ, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল দেশের সকল জাতীয় সকল শ্রেণীর লোক একত্র ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারিবে, এই জন্য ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও জাতি ভেদ প্রথা ব্রাহ্মসমাজ হইতে উঠিয়া যায় নাই।

তাঁহার সময়ে ও তাঁহার পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত বাক্যে না হউক কিন্তু কার্য্যে এক প্রকার জাতিভেদ বর্ত্তমান ছিল। উচ্চ বর্ণ কদাচ নীম্ন বর্ণের সহিত আদান প্রদান করিতেন না। প্রকাশ্য ভাবে একত্র ভোজন করিতেন না। কেশব বাবু এই দূষিত বৈষম্য মূলক অপবিত্র প্রথাকে ব্রাহ্ম সমাজ হইতে সমূলে বিনষ্ট করেন। তিনি কার্য্যে সকল বর্ণ, সকল জাতি সকল সম্প্রদায় এক করিয়া ফেলেন। বিভিন্ন জাতি বর্ণ ও সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মদিগকে কেবল পান ভোজন সম্বন্ধে সমান করিলেন না, পান ভোজনেই কেবল জাতিভেদ বিনষ্ট হইল না। তিনি বিভিন্নজাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মগণের মধ্যে আদান প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। আজ কাল যে ব্রাহ্ম সমাজে অসবর্ণ বিবাহ, বিভিন্ন প্রদেশ বাসী ব্রাহ্মের সহিত বিভিন্ন প্রদেশবাসিনী ব্রাহ্ম মহিলার বিবাহ হইতেছে কেশব বাবুই ইহার প্রবর্ত্তয়িতা।

হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু শাস্ত্র আবহমান কাল নারীজাতির প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। জ্ঞানে ধর্ম্মে প্রায় চিরদিন বঞ্চিত থাকিয়া মূর্খতা ও কুসংস্কারের ঘোর তমিস্রাময়ী রজনীর মধ্যে তাহারা ডুবিয়া রহি য়াছে। যদিও প্রাচীন কালের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, হটী বিদ্যালঙ্কার

প্রভৃতি দুই চারি জন বিদুষী রমণী দেখিতে পাওয়া যায়, প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় সুবিস্তৃত হিন্দুসমাজ মধ্যে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। দিগন্ত প্রসারিত হিন্দু সমাজ সমুদ্রের মধ্যে তাহা অতি সামান্য নগণ্য বুদ্‌বুদ্‌মাত্র। সমাজের অধিকাংশ রমণী (সমস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) অজ্ঞান কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন। যাহা মানবের শ্রেষ্ঠ অধিকার, যে অধিকার লাভ করাতে মানুষ মানুষ হইয়াছে, যে জ্ঞান ও ধর্ম্ম মানবকে পশুত্ব হইতে দেবত্বে লইয়া যায় যে স্বাধীনতা, মানব মনের উন্নতির, বিকাশ লাভের সুপ্রশস্ত উপায়, নিষ্ঠুর স্বার্থপর পুরুষগণ তাহা হইতে, আত্মার উন্নতির উপায়, মানব মনের বিকাশ প্রাপ্তির অদ্বিতীয় হেতু, জ্ঞান ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা হইতে চিরকাল তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখিয়া আসিতেছে। স্ত্রীজাতির বেদে অধিকার নাই, বিগ্রহ মূর্ত্তি স্পর্শ করিবার অধিকার নাই, প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা নাই। এত গেল ধর্ম্ম সম্বন্ধে, জ্ঞান সম্বন্ধেও এই কথা। এখনও অনেক স্থানে "মেয়েরা কি লেখা পড়া শিখিয়া চাকরী করিয়া টাকা আনিবে" এইরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের স্ত্রী পুরুষ অধিকাংশের এই ধারণা ছিল ও এক্ষণে আছে যে বিদ্যাশিক্ষা করিলে স্ত্রীলোক বিধবা হয়। স্বাধীনতার কথা আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। সোজা কথায়

এই বলিলেই যথেষ্ট যে তাহারা কারার বন্দিনী। বন্দী-দিগের স্বাধীনতা আছে ত তাহাদিগের নাই। . এতদ্ভিন্ন তাহারা সমাজে অতি অনাদৃত, নিপীড়িত। নানা প্রকারে সমাজ তাহাদিগকে নিপীড়ন করিতেছে। কেবল কি জ্ঞান ধর্ম্ম ও স্বাধীনতায় বঞ্চিত করিয়াই সমাজ ক্ষান্ত হইয়াছে। নানা প্রকারে, বিবিধ বিধানে তাহাদিগকে বিড়ম্বিত করিতেছে। বাল্যবিধবা ইহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অশীতিপর বৃদ্ধের পত্নিবিয়োগ হইলে দারান্তর গ্রহণের অধিকার আছে। এক স্ত্রী বর্ত্ত-মানে ইচ্ছা হইলেই অন্য স্ত্রী বা স্ত্রীগণ গ্রহণ করিবার অধিকার আছে, আর ৭ম কি ৮ম বর্ষীয়া বালিকা যে বাল্য ক্রীড়া ভিন্ন আর কিছুই জানে না; বিবাহ, স্বামী, পতি প্রেম যাহার নিকট অর্থশূন্য নিরর্থক বাক্য ভিন্ন আর কিছুই নহে, সে যদি একবার বিধবা হইল, দুর্ভাগ্য বশতঃ স্বামীধনে বঞ্চিত হইল, তাহা হইলে সংসারের যাবতীয় সুখের নিকট তাহাকে চির বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। দাম্পত্য সুখের কথা দূরে থাকুক, সামান্য আহারাদির সুখ ও তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। একাদশীর দিন পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেও একবিন্দু জল পান তাহার পক্ষে প্রাণী-হত্যার উৎকট মহাপাতক। এইরূপ অসংখ্য প্রকারে অবিশ্রান্ত সমাজ নারীজাতিকে

নিপীড়ন করিতেছে। সকল প্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজ বিশেষতঃ মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন সমাজের এই অত্যাচারের হস্ত হইতে নারীজাতিকে উদ্ধার করেন। নারীজাতি যে সমাজের এক অঙ্গ, পুরুষের সমকক্ষ, ঈশ্বরের কন্যা, আমাদের ভগিণী, অনাদরের নহে কিন্তু আদরের, অশ্রদ্ধার নহে কিন্তু শ্রদ্ধার পাত্রী, জ্ঞান ধর্ম্মে তুল্যাধিকারিণী কেশব বাবুই তাহা বিশেষভাবে প্রচার করেন।

যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশের একটী প্রশস্ত উপায়, কেশব বাবুই তাহার শিক্ষাদাতা।

প্রার্থনাই ধর্ম্মজীবন লাভের অদ্বিতীয় উপায়,ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের প্রার্থনাই একমাত্র সম্বল, কেশব বাবুর দ্বারা এই সত্য বিশেষভাবে (ক্রাইষ্টের পরে) প্রচারিত হইয়াছে। তিনি স্বয়ং প্রার্থনার অভ্যন্তর দিয়াই, প্রার্থনাকে সার সম্বলরূপে গ্রহণ করিয়াই ধর্ম্মজগতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। জগৎকেও তাহাই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্মের স্রোত বন্ধ করিয়াছেন। শিক্ষিত লোকে আর এখন খৃষ্টান হয় না।

আজ কাল যে মানব বিবেকের প্রধান্য বলিয়া একটা শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়; কেশব বাবুই ইহার প্রচার কর্ত্তা। তিনি মানব বিবেকের প্রাধান্য সংস্থাপিত

করেন। বিবেকে সর্ব্বোপরি আসন প্রদান করেন ধর্ম্মজগতে বিবেকই সর্ব্বেসর্ব্বা এই মহান শিক্ষা কেশব বাবুর দ্বারা প্রচারিত হয়।

কেশব বাবু জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্মের সমন্বয় করেন। জ্ঞানযোগও ভক্তিযোগ দ্বারা ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে হইবে এবং উৎসাহী হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে হইবে, ইহা কেশব বাবুর শিক্ষা।

এতদ্ভিন্ন তিনি অশেষ দেশ হিতকর কার্য্যে, সামাজিক কল্যানকর অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা ব্যাপৃত হইয়া,ও অনেক মঙ্গল-কর বিষয়ে উপদেশাদি দ্বারা অনেক শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাহার সমস্ত গুলীর উল্লেখ করিতে গেলে গ্রন্থকলেবর অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। সুতরাং তাহা আর উল্লেখ করা গেল না। প্রধান কয়েকটীই উল্লিখিত হইল। ইহা দ্বারাই পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন কেশব বাবু স্বদেশ বাসীকে, জগৎকে কি মহান শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কার্য্য দ্বারা উপদেশ দ্বারা যে সকল সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন, মানবজাতিকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা অমূল্য।

এতদ্ব্যতীত কেশব বাবু তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে, কোচবিহার বিবাহের পরে, ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী অনেক মত প্রচার করেন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী অনেক অনুষ্ঠান

করেন, আমরা আর তাহার অবতারণা এস্থলে করিলাম না। পাঠক পাঠিকাগণ এই পুস্তক পাঠ করিলেই সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন। এই স্থানেই আমরা আমাদিগের বক্তব্য শেষ করিলাম।

কেশব চন্দ্র সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা মহানগরীস্থ কলুটোলার সুপ্রসিদ্ধ সেন পরিবারে ১৮৩৮ খ্রীঃঅব্দের ১৯ শে নবেম্বর মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম প্যারী মোহন সেন। কেশব চন্দ্র যে পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা একটী বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী বিশুদ্ধ হিন্দু পরিবার। হিন্দুধর্ম্মের যাবতীয় ক্রিয়া কলাপ এই পরিবারে অতি সাত্ত্বিক ভাবে সম্পাদিত হইত। আর কেশব বাবুর জননীও একজন অতি নিষ্ঠাবতী রমণী। এই উভয় দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মজীবন সংগঠনের বিলক্ষণ সাহায্য হইয়াছিল।

কেশব বাবু ভবিষ্যতে যে একজন মহৎ লোক হইবেন, এই সময়েই তাহার অনেক লক্ষণ অতি পরিস্ফুটরূপে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার পিতামহ সুবিখ্যাত রামকমল সেন মহাশয় সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে

পারিয়াছিলেন যে কালে কেশব একজন অতি মহৎ লোক হইবেন। দুই কি আড়াই বৎসর বয়সে একদিন কেশব বাবু মাতৃ ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাকে দেখিয়া রামকমল সেন মহাশয় বলিয়াছিলেন যে "এই বালক আমার গদিতে বসিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইবে।" তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইয়াছে।

যে স্বাধীন কর্ত্তৃত্বভাব তাঁহার জীবনের একটী প্রধান অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া এক সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মকে নববলে বলীয়ান ও নবজীবনে উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিল, এবং তৎপরে আবার ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বনাশের অমোঘ অস্ত্রস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাও এই সময়ে তাঁহার জীবনে বিশেষরূপে দৃষ্ট হইত। তিনি যে সকল সমবয়স্ক বালকগণের সহিত বাল্যক্রীড়া করিতেন, নেতা হইয়া তাহাদিগের সকলকে পরিচালিত করিতেন। সমবয়স্ক বালকগণ সহজেই তাঁহার অনুগামী হইত।

যে অসাধারণ প্রতিভাবলে তিনি সমগ্র পৃথিবীকে স্তম্ভিত করিয়া গিয়াছেন, এই সময়ে, জীবনের এই মধুময় প্রভাতকালে তাহারও কিছু কিছু আভাস পাওয়া গিয়াছিল। তিনি টাউনহল প্রভৃতি স্থানে যে সকল তামাসা বা ভোজবাজী দেখিয়া আসিতেন, বাড়ীতে সমবয়স্ক সঙ্গীগণের সহিত সেই সকল তামাসা ও ভোজ-

বাজী দেখাইয়া লোকদিগকে বিস্ময়াপন্ন করিতেন। বাস্তবিক তিনি অন্যের সদ্‌গুণরাশি অতি সহজেই আয়ত্ত করিতে পারিতেন! এসম্বন্ধে ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন যে "আমাদের মনে কোন ভাবের উদয় হইলে, আমরা তাহা সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিতে পারি না; যদিওবা প্রকাশ করিতে সমর্থ হই, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারি না; যদিও কার্য্যে পরিণত করিতে পারি, কিন্তু অন্যের দ্বারা করাইয়া লইতে পারি না। কিন্তু কেশবের এ সমস্ত গুণই ছিল।" কেশব বাবু স্বয়ংও বলিয়াছেন, আমার মনে ব্লটিং কাগজের ন্যায় এমন একটী বস্তু বিদ্যমান আছে, যদ্দ্বারা আমি অন্যের সদ্‌গুণরাশি সহজেই শোষণ করিয়া লইতে পারি।

ক্রমে কেশব বাবু শৈশব অতিবাহিত করিয়া কৈশোরে পদার্পণ করিলেন। বর্ত্তমান এলবার্ট হল নামক অট্টালিকা যেস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, পূর্ব্বে তথায় একটী সামান্য পাঠশালা ছিল, এই স্থানেই কেশব বাবুর বিদ্যারম্ভ হয়। পরে তিনি হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ইংরেজী অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। এই স্থানে তিনি সেকেণ্ড সিনিয়ার ক্লাস পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে প্রবেশ করেন। এই বিদ্যা-

লয়টী দেশীয়দিগের দ্বারা সংস্থাপিত হইয়া কিছুকাল জীবিত থাকিয়া উঠিয়া যায়। পরে কেশব বাবু প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন। গণিত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকাতে তিনি শিক্ষাকার্য্যে বিশেষ গৌরব লাভ করিতে পারেন নাই। পরে তিনি ইতিহাস, ন্যায় ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। সেক্‌স্‌পিয়ার মিল্টন ও ইয়ংএর কবিতা সমূহ তাঁহার অতি আদরের সামগ্রী ছিল। বেকনের সন্দর্ভগুলিও যত্ন করিয়া অধ্যয়ন করিতেন। এই সময়ে তিনি অধ্যয়নে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন। নয় কি দশ বৎসর বয়সের সময় তিনি তিলক কাটিয়া সর্ব্বাঙ্গে চন্দনের ছাপ দিয়া গরদের যোড় পরিয়া মৃদঙ্গের সঙ্গে সংকীর্ত্তন করিতেন। এই সময়ে তিনি কিছু আত্মাভিমানী ছিলেন। সমবয়স্ক সহচরগণ এজন্য তাঁহাকে কিছু ভয় করিত; বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করিত।

ক্রমে যৌবন আসিয়া কৈশোরকে অধিকারভ্রষ্ট করিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল। কেশব বাবু যৌবনে পদার্পণ করিলেন। যৌবনের অপূর্ব্ব শ্রী তাঁহাকে অধিকতর মনোহর করিয়া তুলিল। সম্পতিপন্ন পরিবারের ছেলেরা যৌবনের প্রারম্ভে যেরূপ কুৎসিত

আমোদ ও দুর্নীতি পরায়ণ হইয়া উঠে, তিনি সেরূপ হন নাই। পাপ ও দুর্নীতির উপর তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা এবং ধর্ম্ম ও নীতির প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ছিল। এই সময় হইতেই তিনি অত্যন্ত মিতাচারী ছিলেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ ও প্রভাহীন ছিল। ইহাও কলেজ পরিত্যাগের অন্যতর কারণ।

১৮৫৭ খ্রীঃঅব্দে কেশব বাবু তাঁহার পৈতৃক পূর্ব্ব বাসস্থান গৌরীভা গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ কবি সেক্‌সপিয়ার প্রণীত "হ্যামলেট" (Hamlet) নামক জগদ্বিখ্যাত নাটক অভিনয় করেন। প্রসিদ্ধ বক্তা ও ধর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহকারী ও সহযোগী ছিলেন। এই গৌরীভা গ্রামে তিনি একবার বাজীকর সাহেব সাজিয়া এমন আশ্চর্য্য বাজী দেখাইয়াছিলেন ও ইংরেজী ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিয়াছিলেন যে ইউরোপীয়গণও মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে ইউরোপীয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

যে প্রার্থনা তাঁহার জীবনের নেতা হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম জগতের অতি উচ্চতর স্থানে লইয়া গিয়াছিল, যে প্রার্থনা দ্বারা তিনি উন্নত ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছিলেন, জীবনের এই সময়েই তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছিল। এই সময় হইতেই তাঁহাকে প্রার্থনাশীল দেখিতে পাওয়া

যাইত। এই সময়কার প্রার্থনায় তিনি বিভু শব্দ অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতেন। খ্রীষ্টানদিগেরন্যায় ইংরেজী ভাষায় "O Lord" বলিয়া প্রার্থনা করিতেন, তাহাতে তাঁহার সঙ্গীগণ তাঁহাকে খ্রীষ্টান বলিয়া সন্দেহ করিত।

কেশব বাবুর প্রথম লোক হিতকর কার্য্য কলুটোলার নৈশ বিদ্যালয় সংস্থাপন। ১৮৫৫ খ্রীঃঅব্দে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তিনি এখানে সমবয়স্ক বন্ধুগণের সহিত দরিদ্র বালক ও শ্রমজীবী লোকদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে উপদেশ দিতেন।

১৮৫৬ খ্রীঃঅব্দের ২৭শে এপ্রিল বালী গ্রামের কোন সম্ভ্রান্ত বৈদ্য কুলোদ্ভবা সুলক্ষণসম্পন্না গোলাপসুন্দরী নাম্নী একটী বালিকার সহিত কেশব বাবুর উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই বিবাহে তাঁহার অভিভাবকগণ যথেষ্ট সমারোহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর কেশব বাবু বিশেষভাবে নির্জ্জন ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা একাকী থাকিতেন। জন কোলাহল হইতে আপনাকে সর্ব্বদা দূরে রাখিতেন। বন্ধু বান্ধবগণের সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিতেন না। পত্নীর সহিত ভাল করিয়া সাক্ষাৎ করিতেন না। এজন্য সময়ে সময়ে তাঁহার স্কন্ধে অহঙ্কারী অপবাদ নিক্ষিপ্ত হইত। বাস্তবিক তাঁহার শিষ্টাচার ও লৌকিকতা বড় অধিক ছিল না, এজন্য

অনেক সময়ে অপরিচিত লোকের সহিত তাঁহার ব্যবহার বড় প্রীতিকর হইয়া উঠিত না।

এই সময়ে, যৌবনের এই প্রারম্ভ অবস্থাতে, তিনি ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ ও ধর্ম্ম চিন্তাতে বিশেষরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের বর্ত্তমান উন্নতাবস্থা ইহারই ফল। এইরূপে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও চিন্তা করিতে করিতে তিনি ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি যে প্রার্থনা অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই প্রার্থনাই তাঁহার জীবনের প্রধান সম্বল হইয়া উঠিল। তিনি প্রার্থনার অভ্যন্তর দিয়া দিন দিন ধর্ম্মজগতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে তিনি পাদরী বারন্ সাহেবের নিকট বাইবেল পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। বৈষ্ণব পরিবারের মধ্যে অবস্থান করিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র পাঠ করা পরিবার বর্গের বিশেষ ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল; পাছে তিনি খৃষ্টান হইয়া যান। আর সে সময়ে খৃষ্ট ধর্ম্মের দিকে লোকের অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক পরিমাণে আসক্তি ছিল। কেশব বাবু এইরূপে ইউরোপীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের নিকট উৎকৃষ্ট ধর্ম্মমত ও পরমার্থজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বিদেশীয় মত ও জ্ঞানের সহিত দেশীয় জ্ঞান ও মতের সংমিলন হইয়া পূর্ণতা লাভ করিল। তিনি যাহা কিছু শিক্ষা করিয়া-

ছিলেন, তাহার অধিকাংশই বিদেশের নিকট, কিন্তু তাহাতে তিনি দেশীয় ভাব পরিত্যাগ করেন নাই। আহার, পরিচ্ছদ প্রভৃতি সকল বিষয়েই তিনি দেশীয় ভাব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। যে ইংলণ্ডকে পাদ দ্বারা স্পর্শ করিয়াই আমাদিগের শিক্ষাভিমানী যুবকগণ সাহেব সাজিয়া বসেন, ইণ্ডিয়ার আব হাওয়াকে দূষিত ও বিষাক্ত মনে করেন, ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে যাওয়াকে হোমে (Home) যাওয়া বলেন, কেশব বাবুর এই ব্যবহার তাঁহাদিগের বিশেষ শিক্ষনীয় ও অনুকরণ যোগ্য। কেশব বাবুও ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন।

কেশব বাবু প্রার্থনাকে সঙ্গে করিয়া বিশ্বাসের ভূমি অবলম্বন করিয়া দিন দিন ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বাইবেল প্রভৃতি পাশ্চাত্য ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠ করিয়া তিনি ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া জানিতে পারিলেন। দারু, প্রস্তর, ধাতু বা মৃণ্ময় মূর্ত্তিতে ঈশ্বরজ্ঞান এবং ঈশ্বরের সাকারত্ব ঐ সকল পুস্তক পাঠ দ্বারাই তিনি ভ্রমাত্মক বলিয়া বুঝিতে পারেন। এই সময়ে কেশব বাবু স্বহস্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজে "হে পথিকগণ এ পৃথিবীতে শান্তি নাই, তোমরা কি চিন্তা করিতেছ, মৃত্যুকে স্মরণ কর।" ইত্যাদি লিখিয়া পথ পার্শ্বস্থ প্রাচীরের গায়ে লাগাইয়া দিতেন। লোকে মনে করিত, হয়তঃ

কোন পাদরী এইরূপ করে। তাঁহার বয়স্যগণ এজন্য অনেক সময়ে তাঁহাকে উপহাস করিত, কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হইতেন না।

ইহার পর "গুড্ উইল্ ফ্রেটারনিটী" ও "ব্রিটীশ্ ইণ্ডিয়ান্ সোসাইটী" নামক দুইটী সভা সংস্থাপিত হয়। প্রথম সভার উদ্দেশ্য ধর্ম্মালোচনা। ইহা কেশব বাবুর কলুটোলার বাটীতে হইত। এই সভাতেই কেশব বাবু প্রার্থনা ও বক্তৃতা করিতে শিক্ষা করেন। দ্বিতীয় সভা হিন্দু কলেজ থিয়েটার গৃহে হইত। সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চ্চাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। কলেজের জ[redacted] অধ্যাপক ইহার সভাপতি ছিলেন। মহাত্মা উড্রো এবং পাদরী রেভারেণ্ড ডল্ ইহার উৎসাহ দাতা ছিলেন। বিশ্ব বিমোহিনী বক্তৃতাশক্তি তিনি প্রথমে এই স্থানেই লাভ করেন। অনন্তর "রাজ নারায়ণ বসুর বক্তৃতা" নামক এক খানি পুস্তক দৈবাৎ তাঁহার হস্তগত হয়। এই পুস্তক পাঠ করিয়া তিনি দেখিলেন যে তাঁহার ধর্ম্ম মত ও এই পুস্তকোল্লিখিত ধর্ম্মমত এক প্রকার। এই পুস্তক খানি ব্রাহ্ম সমাজ হইতে বাহির হইয়াছিল। ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম্মমতের সহিত তাঁহার স্বীয় ধর্ম্ম মতের ঐক্য হওয়াতে তাঁহার মন ব্রাহ্ম সমাজের দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি ব্রাহ্ম সমাজে প্রবিষ্ট হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৫৭ খৃঃঅব্দের শেষ ভাগে কেশব বাবু ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব্ব হইতেই তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই যাতায়াত উপলক্ষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই সময়ে তাঁহার অভিভাবকগণ তাঁহাকে মন্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই। অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তি-মান অনন্ত ভূমা মহান অসীম নিরাকার ঈশ্বর যাঁহার উপাস্য, তিনি কি প্রকারে পরিমিত সসীম ক্ষুদ্র পৌত্ত-লিকতার নিকট আত্ম সমর্পণ করিবেন? প্রশান্ত মহাসাগ-রের সুদূর প্রসারিত অতলস্পর্শ গভীর জলে যাহার বাস, সে কি কখন ক্ষুদ্র কূপে বাসস্থান মনোনীত করিতে পারে? অনন্ত প্রসারিত গগন-বিহারী বিহঙ্গম কি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ক্ষুদ্র পিঞ্জরে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করে? বাড়ীতে মন্ত্র গ্রহণের সমস্ত আয়োজন হইল, গুরু উপস্থিত হইলেন, কিন্তু মন্ত্র গ্রহণ করিবে কে? কেশব বাবু সে দিবস বাড়ীতে আসিলেন না। দেবেন্দ্র বাবুর বাটীতে থাকিলেন। মন্ত্র গ্রহণ উদ্যোগে তাঁহার মাতাই বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। কেননা তাঁহার ভয়, কেশব

প্রচলিত উপধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধাবান হইলে পাছে নিপীড়িত ও বাটী হইতে বহিষ্কৃত হন। তাহাতে আবার তিনি পিতৃহীন। কেশব বাবু অল্প বয়সেই পিতৃহীন হইয়াছিলেন। সমস্ত দিন দেবেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে অতিবাহিত করিয়া রজনী দশ ঘটিকার সময় তিনি বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন। বাড়ীতে আসিয়া মাতাকে ব্রাহ্ম সমাজের কয়েকখানি পুস্তক দিলেন। তাঁহার মাতা সেইগুলী গুরুকে দেখাইয়া বলিলেন, "দেখুন আমার কেশব এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।" গুরু পুস্তক পাঠ করিয়া বলিলেন "ধর্ম্ম ত উত্তম, প্রতি পালন করিতে পা[illegible] হয়। মা তুমি ভীত হইও না, কেশব যে পথ ধরিয়াছে, তাহাতে তাঁহার মঙ্গল হইবে।" এই হইতে মাতা তাঁহার ধর্ম্ম পথের সহায় হইলেন। তিনি যে কার্য্যই করিতেন, তাহাতেই মাতার নিকট যথেষ্ট সহানুভূতি পাইতেন। ইহাতে অন্যান্য লোকে বলিত, মাতাই কেশবকে মন্দ করিল। বলা বাহুল্য যে কেশব বাবু মন্ত্র গ্রহণ না করাতে তাঁহার স্বজনবর্গের নিকট তিনি অতি অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময় হইতে তাঁহাকে অত্যন্ত পরীক্ষার মধ্যে পতিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু এক দিকে যেমন আত্মীয় স্বজনগণের নির্য্যাতন, অন্যদিকে আবার সেইরূপ মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের অপরিমেয় স্নেহ ও সাহায্য। সুতরাং

পরীক্ষাতে পতিত হইয়াও তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। তাঁহার পরীক্ষা ও নির্য্যাতনের কথা শুনিয়া দেবেন্দ্র বাবু তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য স্বীয় দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়কে তাঁহার কলুটোলার বাড়ীতে প্রেরণ করেন। এই সময়ে কেশব বাবু বিধবাবিবাহ নাটক অভিনয় করেন। অভিনয় কার্য্য অতি সুন্দর হইয়াছিল। মৃত গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে এই নাটক অভিনীত হইয়াছিল।

১৮৫৯ খ্রীঃঅব্দের ২৪শে এপ্রিল এই গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে অল্পবয়স্ক যুবকদিগের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের সাহায্যে ও উৎসাহে তিনি এক ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখানে দেবেন্দ্র বাবু বাঙ্গালাতে ও কেশব বাবু ইংরেজীতে ধর্ম্মবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। কেশব বাবুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা সকল পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া অনেক ধর্ম্মপীপাসু যুবককে ব্রাহ্মসমাজে আনয়ন করিয়াছে। কেশব বাবুর সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের যোগ হইলে স্কুল ও কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত আন্দোলন আরম্ভ হয়। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের স্রোত মন্দীভূত হইয়া আইসে, এবং যাঁহারা হিন্দু ও খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া নাস্তিকতার হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও

কেশব বাবুর অনুবর্ত্তী হইয়া নাস্তিকতা হইতে আত্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যালয় কিছু দিন মল্লিক বাড়ীতে থাকিয়া কলুটোলার কোন বাড়ীতে উঠিয়া আইসে। পরে আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতল গৃহে হইতে আরম্ভ হয়।

ব্রাহ্মগণ অনন্তর ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে ভিত্তি অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহা নিরাপদ নহে। ইহাকে এমন একটী সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে তাঁহারা কৃতসংকল্প হইলেন, যাহাতে কদাচ ইহার পতন হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। সেই ভিত্তি সহজ জ্ঞান।

জাতি নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোক একস্থানে সমবেত হইয়া নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবে, এই উদার মহান্ সত্যটী মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রচার করেন; এবং সেই জন্য একটী উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এক্ষণে যেমন মত ও অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মধর্ম্মের অপৌত্তলিকতা রক্ষা করিয়া অনেকগুলি ব্রাহ্ম পরিবার সংস্থাপিত হইয়াছে, সে সময়ে ইহার কিছুই ছিল না। কতকগুলি অনিশ্চিত

ও অনির্দ্দিষ্ট লোক প্রতি বুধবারে একত্র হইতেন মাত্র। তখন উপাসনার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ছিল না। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধান অনুসারে কোন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইত না। যিনি যে সম্প্রদায়ের লোক তিনি সেই সম্প্রদায়ের অবলম্বিত পদ্ধতি অনুসারে যাবতীয় অনুষ্ঠান নির্ব্বাহ করিতেন। একটী হাটে যেমন নানা স্থান হইতে নানা জাতীয় লোক কিছুক্ষণের জন্য সমবেত হয়, রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে এবং তাঁহার পরেও অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম সমাজের তদনুরূপ অবস্থা ছিল। রাম মোহন রায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে বেদরূপ মূল ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করেন। বেদান্ত শাস্ত্রে যে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা আছে, তাঁহার ব্রাহ্ম ধর্ম্ম তদনুরূপ ছিল। ধর্ম্মবীর পূজ্যপাদ লুথার যেমন বাইবেলকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হন, পরম শ্রদ্ধেয় রাজা রাম মোহন রায় সেইরূপ বেদকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম সংস্কার করতঃ উদার সার্ব্বভৌমিক নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করেন। যদিও বেদকে তিনি মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার উদার মন অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করে নাই। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মমতের পোষক যে কোন সত্য তিনি যে কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রাপ্ত হইতেন, সমা-

দরে তাহা গ্রহণ করিতেন। তাঁহার উদার বিশ্বজনীন হৃদয় কেবল দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেই আবদ্ধ থাকে নাই। এই তাঁহার মহত্ব, এই তাঁহার উদারতা। যদিও তাঁহার মত অত্যন্ত উদার ছিল, তথাপি তিনি সর্ব্বদা জাতীয় ভাব রক্ষা ও স্বজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি অধিকতর অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। এই জন্যই তাঁহার সময়ে ব্রাহ্মসমাজে হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রতি অধিক সমাদর প্রদর্শিত হইত। আর তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহাদিগের স্বকীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। ইহাতে অধিক-তর ফল লাভ হয়, তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসটী যে ভ্রমাত্মক নহে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইবার পর ইহার অনেক উন্নতি হয়। তিনি চারি জন পণ্ডিতকে বেদাধ্যয়ন করিবার জন্য কাশীতে প্রেরণ করেন। প্রেরিত পণ্ডিত চতুষ্টয় বেদ অধ্যয়ন করিয়া প্রত্যা-গত হইলে তাঁহাদিগের সাহায্যে দেবেন্দ্র বাবু বেদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। বেদ আলোচনা করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে বেদে অনেক ভ্রম প্রমাদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার অনেক স্থান অদ্বৈত বাদে পরিপূর্ণ। তখন আর তিনি বেদকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল ভিত্তি বলিয়া

গ্রহণ করিতে পারিলেন না। ইহার পর কিছুদিন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে যুক্তি ও জ্ঞানরূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করা হয়। অনন্তর সহজ জ্ঞানই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত ভিত্তি ভূমি,যুক্তি ও জ্ঞান বাস্তবিক মূল ভিত্তি নহে। ইহা দেবেন্দ্র বাবু সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন। এ সম্বন্ধে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট তিনি অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। * এতদ্ভিন্ন দেবেন্দ্র বাবু ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতি সংকলন করেন। অনির্দ্দিষ্ট উপাসকগণকে এক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া একটী উপাসকমণ্ডলী দলবদ্ধ করেন। এই সময়ে যাঁহারা ব্রাহ্ম হইতেন, তাঁহাদিগকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইত যে "প্রতি দিন নিরাকার অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তিমান মঙ্গলদাতা সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে উপাসনা করিব। সৃষ্ট কোন বস্তুকে ঈশ্বর জ্ঞানে উপাসনা করিব না। রোগ বা বিপদ্‌গ্রস্ত না হইলে প্রতিদিন উপাসনায় ক্ষান্ত হইব না। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নবান থাকিব। মোহবশতঃ কোন পাপ

* কেশব বাবুর জীবনচরিত লেখক মাননীয় চিরঞ্জীব শর্ম্মা বলেন যে কেশব বাবুই ব্রাহ্মধর্ম্মকে সহজজ্ঞানরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু "ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত" নামক গ্রন্থে দেবেন্দ্র বাবুর দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদিত হয় লিখিত আছে।

করিলে অকৃত্রিম অনুতাপ করিব। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি কল্পে বর্ষে বর্ষে কিছু কিছু দান করিব।” দেবেন্দ্র বাবু কতকগুলি লোককে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাইলেন বটে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত অপৌত্তলিক ব্রাহ্ম পরিবার সংগঠিত হইল না। উপাসকগণ যদিও প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্ম হইতেন, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হইত না। প্রতিজ্ঞা করিতেন বটে, কিন্তু তদনুসারে কার্য্য করিতেন না। অপৌত্তলিক ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে তাঁহারা কোন অনুষ্ঠানই করিতেন না। পৌত্তলিকতা দোষ পরিশূন্য পবিত্র ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সাংসারিক অনুষ্ঠান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দ্বারা সর্ব্ব প্রথমে অনুষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু কেশব বাবুই তাহা ব্রাহ্মসমাজে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই হইতেই ব্রাহ্মসমাজের স্থায়িত্বের সূত্রপাত হইল। বর্ত্তমান সময়ে যে অনেকগুলি ব্রাহ্ম পরিবার প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে বদ্ধমূল করিয়াছে, কেশব বাবুই তাহার মূল পত্তন করেন। দেবেন্দ্র বাবু ও কেশব বাবুর প্রযত্নে ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া, এইরূপ নূতন আকার ধারণ করিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রচারিত ধর্ম্মের সহিত এই ধর্ম্মের যে অনেক প্রভেদ, তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। কেশব চন্দ্র সেন আর

একটী মহান্ সত্য প্রচার করেন, সেই সত্যটী বিবেকের প্রাধান্য।

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে নস্য গ্রহণ, আমিষ ভোজন পরিত্যাগ, মোটা চাদর, চটি জুতা, চস্‌মা ব্যবহারের কিছু ধূম পড়িয়া যায়। কেশব বাবুকে সংসারী করিবার জন্য তাঁহার আত্মীয়গণ এই সময়ে বিশেষ যত্নবান হন। এই যত্নের ফল তাঁহার বেঙ্গল ব্যাঙ্কে চাকরী গ্রহণ। ১৮৫৯ খৃঃ অব্দের ১লা নবেম্বর তিনি ত্রিশ টাকা বেতনে উক্ত ব্যাঙ্কে নিযুক্ত হন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। উৎকৃষ্ট হস্তাক্ষরের জন্য ডিপুটী সেক্রেটারী কুক্ সাহেব তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। ত্রিশ হইতে তাঁহার বেতন পঞ্চাশ করিয়া দেন। এই স্থানে অবস্থানকালীন কার্য্যালয়ে বসিয়াই "হে বঙ্গীয় যুবক ইহা তোমারই জন্য।" নামক পুস্তক রচনা করেন। সেই পুস্তক দেখিয়া সেক্রেটারী ডিক্‌সন্ সাহেব তাঁহার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা বলেন। বেঙ্গল ব্যাঙ্কের নিয়ম আছে যে, কার্য্যালয়ের কোন গোপনীয় কথা প্রকাশ করিব না, এই মর্ম্মে কর্ম্মচারীগণকে প্রতিজ্ঞা করিতে হয়। বিবেক সায় না দেওয়াতে কেশব বাবু এই প্রতিজ্ঞা করেন নাই। কিন্তু উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণ ইহাতে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হন নাই। তিনি এই কার্য্যে

অধিককাল থাকিতে পারেন নাই। বিশ্বপতি ঈশ্বর যাঁহার একমাত্র প্রভু, তিনি কি সামান্য মানুষকে প্রভু বলিয়া মানিতে পারেন ? ১৮৬১ খৃঃঅব্দের ১লা জুলাই তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। যে সময়ে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করেন, তখন ডিক্‌সন্ সাহেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে "তুমি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিও না, আমি শীঘ্রই তোমার একশত টাকা বেতন করিয়া দিব। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে পাঁচ শত টাকা বেতন দিলেও আর চাকরী করিব না।

১৮৬২ খৃঃঅব্দের ১৩ই এপ্রিল তিনি কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের (বর্ত্তমান আদি ব্রাহ্মসমাজ) আচার্য্য পদে অভিষিক্ত হন। এই সময়ে মহর্ষি তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দ উপাধি প্রদান করেন। যেদিন তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদে বরণ করা হয়, সেই দিন প্রাতঃকালে কেশব বাবু সপরিবারে দেবেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে যাইতে উদ্যোগী হন। ইহাতে আত্মীয়বর্গ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। যাহাতে তাঁহার সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইতে না পারে, তাঁহারা তাহার জন্য বদ্ধপরিকর হই-লেন। কেশব বাবু পূর্ব্ব রাত্রিতে পত্নীর সহিত দেবেন্দ্র বাবুর বাড়ী যাওয়ার বিষয় স্থির করিয়া মাতাকে সেই কথা বলেন। মাতাও তাহাতে অনুমতি প্রদান করেন।

সকাল বেলা তিনি সস্ত্রীক গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন, এদিকে গৃহস্বামীর আদেশে বাড়ীর বহির্দ্বার অবরুদ্ধ হইল। চারিদিকে আত্মীয়গণ মধ্যস্থলে কেশব চন্দ্র দণ্ডায়মান হইয়া পত্নীকে বলিলেন, "হয় আমার সঙ্গে অগ্রসর হও, নতুবা গুরুজনের পশ্চাদ্বর্ত্তী হও। এই সময়।" এই বলিয়া তিনি বহির্দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বহির্গত হইলেন। পত্নীও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। আত্মীয়গণ মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। এই অপরাধে কেশব বাবুকে কয়েক মাস বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। তিনি কিছুকাল দেবেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে অবস্থান করিয়া, পরে কলুটোলায় একটী ক্ষুদ্র বাড়ীতে সস্ত্রীক বাস করেন। এই স্থানে তিনি দুশ্চিকিৎস্য ক্ষত রোগে সাংঘাতিকরূপে আক্রান্ত হন। পাঁচবার অস্ত্র প্রয়োগের পর বহু কষ্টে রোগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করেন। এই সময়ে তাঁহার প্রথম পুত্র করুণা চন্দ্র সেন জন্ম গ্রহণ করেন। অনন্তর কেশববাবু স্বজনগণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হন।

হিন্দুধর্ম্মের দুর্গস্বরূপ তাঁহার বাস ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে পুত্রের জাতকর্ম্ম সম্পন্ন করেন। এই কার্য্যে আত্মীয়গণ তাঁহাকে বাধা দিতে পারেন নাই। এই অনুষ্ঠানে মহর্ষি অতি উৎসাহের

সহিত যোগ দান করিয়াছিলেন। এই দিন বাড়ীর কর্ত্তা বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন।

ইহার পর কেশব বাবু দেবেন্দ্র বাবুর সহিত সিংহল গমন করেন। ইহাতে তাঁহার জাতিত্বের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা শেষ হইল।

সিংহল হইতে ফিরিয়া আসিয়া কেশব বাবু খ্রীষ্টান-দিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। আজ কাল খৃষ্টধর্ম্ম ভারতে যেরূপ হীনপ্রভ ও ক্ষীণবীর্য্য, সে সময়ে এরূপ ছিল না। খৃষ্টধর্ম্ম সে সময়ে ভারতে অত্যন্ত প্রবল ছিল। শিক্ষিত যুবকগণের মন তখন খৃষ্টধর্ম্মের দিকে অধিক আকৃষ্ট হইত। অনেক কৃতবিদ্য লোক এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেশব বাবু এপর্য্যন্ত যে সকল বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্মের মধ্যবর্ত্তিত্ব, অনন্ত নরক, বাহ্যিক প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি ভ্রমাত্মক মত সমূহ খণ্ডিত হইয়া যায়। ইহাতে খ্রীষ্টীয় মিসনরিগণ কেশব বাবুর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন ভিত্তি নাই বলিয়া উপহাস করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে কেশব বাবু বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য কিছুকাল কৃষ্ণনগরে শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করেন। এই স্থানে পাদরী ডাইসনের সহিত তাঁহার প্রথম ধর্ম্ম-

যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বক্তৃতা দ্বারা এই সংগ্রাম হইয়াছিল। কিছুকাল সংগ্রাম করিয়া সাহেব পৃষ্ঠভঙ্গ দেন। ডাইসন সাহেবকে পরাস্ত করাতে কেশব বাবু নবদ্বীপের অধ্যাপক মহাশয়গণের নিকট অত্যন্ত ধন্যবাদ পাইয়াছিলেন। অনন্তর রেভারেণ্ড লালবিহারী দে মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিচার হয়। ইহাতেও কেশব বাবু জয়ী হন। ইহার পর আর কোন খৃষ্টশিষ্য কেশব বাবুর সহিত বিচার করিতে অগ্রসর হন নাই। ইহার কিছুদিন পরে কেশব বাবু আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতল গৃহে "ব্রাহ্মসমাজ সমর্থন" নামক একটী বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা শুনিয়া মহাত্মা ডফ্ স্বীকার করেন যে ব্রাহ্মসমাজ একটী মহতী শক্তি।

ইহার কিছুকাল পরে কেশব বাবুর যত্নে সঙ্গত সভা সংস্থাপিত হয়। তাঁহার কলুটোলার বাস ভবনে এই সভার অধিবেশন হইত। ধর্ম্মচর্চ্চা চরিত্র সংশোধন ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে নানা কথার আলোচনা এখানে হইত। ধর্ম্মসাধন নামক পুস্তকে সঙ্গত সভার আলোচিত বিষয়ের সার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ আছে। এই সভা স্থাপনের পর কেশব বাবু "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" নামক পুস্তক প্রচার করেন। এই পুস্তক প্রচারিত হইলে দেবেন্দ্র বাবু উপবীত পরিত্যাগ করেন ও ব্রাহ্মমতে স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন।

এই সময়ে কেশব বাবু ব্রাহ্মসমাজে এক প্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার হস্তে ব্রাহ্মসমাজের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক যাবতীয় ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু কেশব বাবু ও তাঁহার সমবয়স্ক যুবক ব্রাহ্মগণ আর অধিক দিন এই সমাজের সহিত যোগ রাখিতে পারিলেন না। তাঁহারা এমন কতকগুলি কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলেন, যাহাতে ব্রাহ্মদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মসমাজের যে সকল পুরাতন প্রাচীন সভ্য ছিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী; কেশব বাবু ও তাঁহার সমবয়স্ক যুবক ব্রাহ্মগণ অত্যন্ত বিপ্লবশীল। তৎকাল প্রচলিত সামাজিক রীতি নীতি রক্ষা করা প্রাচীন ব্রাহ্মগণের আন্তরিক ইচ্ছা, সেই সকল দূষিত রীতি নীতি দূর করিয়া তাহার স্থানে সংস্কৃত রীতি পদ্ধতি প্রচলিত করা কেশব বাবু ও যুবক ব্রাহ্মগণের হৃদয়ের বাসনা। এই বিষয় লইয়া সময়ে সময়ে দুই দলে সংঘর্ষণ উপস্থিত হইত। কিন্তু তাহা তত প্রবল হয় নাই। নব্যদল যখন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিলেন, তখন দুই দলের একত্র অবস্থান করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। পূর্ব্ব হইতেই মহর্ষির মত অনেক পরিমাণে রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী ছিল; কেবল কেশব বাবুর জন্য অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু কিছু

অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু নব্যদল যখন দ্রুতপাদ বিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন আর তিনি তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতে পারিলেন না।

১৮৬২ খ্রীঃঅব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে নব্যদলের উদ্যোগে একটী অসবর্ণ বিধবা বিবাহ হয়। পাত্র শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত,জাতিতে বৈদ্য। ইনি একটী বিধবা বৈষ্ণব কন্যাকে বিবাহ করেন। এইটীই ব্রাহ্মসমাজে প্রথম সঙ্করবিবাহ। ইহার পূর্ব্বেও দুইটী সমাজচ্যুত অজ্ঞাত কুলশীল যুবক যুবতী ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধান মতে বিবাহ সুত্রে আবদ্ধ হন। এই দুই ঘটনায় বিরোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

দেবেন্দ্র বাবু পূর্ব্ব হইতেই রক্ষণশীলতার দিকে পশ্চাৎ-পদ হইতেছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই অসবর্ণ বিধবা বিবাহের সংবাদ প্রকাশিত হইলে, দেবেন্দ্র বাবু অত্যন্ত বিরক্ত ও ভীত হইলেন। আর তিনি নব্যদলকে সমর্থন করিতে পারিলেন না। প্রাচীন ব্রাহ্মগণও সেই সময়ে, ইহারা জাতিকুল সব নষ্ট করিল, মনে করিয়া দেবেন্দ্র বাবুকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে কেশব বাবু তরলমতি যুবক, তাঁহার উপর সমাজের ভার থাকিলে সমাজের সমূহ অমঙ্গল হইবে। দেবেন্দ্র বাবুও মনে মনে এই আশঙ্কা করিতে-

ছিলেন। এই সময়ে উপবীতধারী আচার্য্য বেদীতে উপবেশন করিতে পারিবে না কেন, এই আন্দোলন উপস্থিত হইল। উপবীতধারী ব্রাহ্মণদিগকে দেবেন্দ্র বাবু বেদীতে উপবেশন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। সুতরাং নব্যদলকে ব্রাহ্মসমাজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। ১৮৬৫ খ্রীঃঅব্দে নব্য ব্রাহ্মদল আদি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কেশব বাবু আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মস্তক রাখিবার স্থান রহিল না। তাহাতে কি তিনি ভীত? না। ভীত হইবেন কেন? সর্ব্বশক্তিমান মহান্ ঐশী শক্তি তাঁহার অভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকিয়া যখন তাঁহাকে অভয়বাণী দ্বারা আশ্বাস প্রদান করিতেছে, তখন সংসারের সামান্য পরীক্ষাতে তাঁহার কি করিতে পারে? জগতে যত সাধু মহাজন জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সকলেরই সাংসারিক অবস্থা অতি হীন ছিল। কিন্তু তাঁহারা এক ঐশী শক্তি প্রভাবে সংসারে যে সকল অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে

বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। মহর্ষি ঈশা দরিদ্র সূত্রধরের-তনয়; সাংসারিক অবস্থা অতি হীন; জগতে মস্তক রাখিবার স্থান নাই; কল্য কি আহার করিবেন, তাহার সংস্থান নাই; কিন্তু এমন এক শক্তি তাঁহার অভ্যন্তরে বিদ্যমান ছিল, যে শক্তি প্রভাবে তিনি প্রবলপ্রতাপ সম্রাটগণ অপেক্ষাও অতি মহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। ঘোর দরিদ্রতার মধ্যে অবস্থান করিয়াও কেবল ধর্ম্মের বলে মহান্ ঐশ্বরিক শক্তিতে ভগবান বুদ্ধ যে অমানুষিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা জগতের ইতিহাসে অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। "সাধু যাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাঁহার সহায়।" এই বাক্যটী একটী অভ্রান্ত মহাসত্য। কেশব বাবুও সর্ব্বশক্তিমান ঐশী শক্তি প্রভাবে, মহিমাময় ধর্ম্মের বলে এবং উল্লিখিত মহাসত্যের সাহায্যে জগতে অতি মহান কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। আর্থিক অনাটন সত্বেও তিনি অনেক বহু ব্যয়-সাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অর্থের অনাটন তাঁহাকে কোন কার্য্যে বাধা দিতে পারে নাই।

আদি ব্রাহ্ম সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেশব বাবু সেয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেসনে "ব্রাহ্ম সমাজ স্বাধীনতা ও উন্নতির জন্য সংগ্রাম।" বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

সিন্দুরিয়াপটীর মৃত গোপাল মল্লিকের ভবনেও তিনি দুইটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অনন্তর ১৭৮৬ শকের ৬ই ফাল্গুন তাড়িত ব্রাহ্মদলকে লইয়া তিনি একটী সাধারণ সভা সংগঠিত করিলেন। তৎসঙ্গে একটী প্রচার বিভাগও সংস্থাপিত হইল। ব্রাহ্মসমাজের যাবতীয় কার্য্য এই সাধারণ সভার মতে সম্পন্ন হইত। এইরূপে ব্রাহ্মসমাজে সাধারণতন্ত্র সংস্থাপিত হইল। স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারিল না। প্রতিষ্ঠাতাই ইহার মস্তকে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি যদি ব্রাহ্মসমাজে স্বীয় মত প্রবল না রাখিয়া সাধারণ মতের আদর ও সম্মান করিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজে যে সকল আন্দোলন উপস্থিত হইয়া ইহাকে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে ও লোকচক্ষে অশ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিয়াছে, তাহা হইত না। আর তাঁহার জীবনী লেখককেও তাঁহার জীবনের কালিমাময় অংশ লোক চক্ষুর নিকট উদ্ঘাটিত করিয়া সন্তপ্ত হইতে হইত না। সভা সংগঠনের পর ১৮৬৬ খৃঃঅব্দের ১১ই নবেম্বর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়। এই সময় হইতে তিনি প্রকাশ্যভাবে প্রচার কার্য্যে ব্রতী হন। কলিকাতা, ভবানীপুর, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থান তাঁহার প্রথম প্রচার ক্ষেত্র হয়। তিনি বক্তৃতা দ্বারা প্রচার করিতেন। তাঁহার

বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে লোকে মুগ্ধ হইয়া যাইত। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণই তাঁহার বক্তৃতায় অধিক আকৃষ্ট হইত।

এইরূপে তিনি তিন চারি বৎসর বঙ্গের নানা স্থানে প্রচার করিয়া ১৮৬৪ খৃঃঅব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি বোম্বে ও মান্দ্রাজ অঞ্চলে প্রচারার্থ গমন করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের অশেষ কল্যাণপ্রদ উদার সার্ব্বভৌমিক সত্য সমূহ প্রচার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হয়েন। তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতায় ঐ সকল প্রদেশের লোক মুগ্ধ হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে উক্ত অঞ্চলের লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। কেশব বাবুই সর্ব্বপ্রথম তথায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। সেই প্রচারের যে কি ফল দর্শিয়াছে, তাহা সাধারণের অবিদিত নাই। এই প্রচার যাত্রা তাঁহার আদি ব্রাহ্মসমাজে অবস্থানকালীন ঘটিয়াছিল।

১৮৬৬ খৃঃ অব্দের ৬ই মে কেশব বাবু মেডিকেল কলেজ থিয়েটারে "যীশুখৃষ্ট, ইউরোপ এবং এসিয়া।" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা শুনিয়া অনেকে সন্দেহ করিয়াছিল যে তাঁহার খ্রীষ্টান হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। পাদরী মহাশয়েরা আহ্লাদে আটখানা হইলেন। মনে করিলেন, "কেশব সেন ত খ্রীষ্টান হইল।" এই বক্তৃতায় সভ্যসমাজে তাঁহার অত্যন্ত খ্যাতি বৃদ্ধি হইল। তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল

সার জন লরেন্স বাহাদুর সংবাদ পত্রে এই বক্তৃতা পাঠ করিয়া সিমলা হইতে তদীয় সহকারী গর্ডন সাহেব দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করেন যে, পর্ব্বত হইতে কলিকাতা ফিরিয়া গিয়া তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তিনি এই সময় হইতে কেশব বাবুকে স্নেহ করিতে আরম্ভ করেন। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার এই স্নেহ অবিচলিত ছিল। কেশব বাবু মহাত্মা লর্ড লরেন্স বাহাদুর দ্বারা তদানীন্তন যাবতীয় প্রধান রাজ কর্ম্মচারীগণের সহিত পরিচিত হন। ইহার কিছুদিন পরে মিস্ মেরী কার্পেণ্টর এদেশে আগমন করেন। তিনি গবর্ণমেণ্ট ভবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং কেশববাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়া লাট ভবনে লইয়া গিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে গবর্ণর বাহাদুরের সঙ্গে তাঁহার অনেক কথা বার্ত্তা হয়, এবং তাঁহাদিগের উভয়ের বন্ধুতা অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। আত্মীয়গণের অনুরোধে এই সময়ে তাঁহাকে কিছুদিন ট্যাঁকশালের দেওয়ানী কার্য্য করিতে হইয়াছিল। অনন্তর ২৮শে ডিসেম্বর তিনি মহাপুরুষ (Great men) বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। ভবিষ্যতে যে তিনি একজন মহাপুরুষ হইয়া দাঁড়াইবেন, এই বক্তৃতা তাহার পূর্ব্বাভাস। এই বক্তৃতা শুনিয়া শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মন সন্দিগ্ধ হইয়াছিল।

তাঁহার সন্দেহ যে নিরর্থক হয় নাই, তাহা এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মগণও এই বক্তৃতায় ভীত হইয়াছিলেন। ভীত হইবার কারণও ছিল এবং তাহা কার্য্যেও পরিণত হইয়াছে। ইহার পর হইতেই অনেক ব্রাহ্ম কেশব বাবুর প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠেন। এই বৎসরের শেষ ভাগে তিনি ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচারার্থ গমন করেন। তাঁহার গমনে ঐ সকল অঞ্চলে অত্যন্ত আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। এই স্থানে তাঁহাকে ভৃত্য ও পাচক অভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়। বৈষ্ণবদিগের আঁখড়াতে কদর্য্য অন্ন ভোজন করিয়া তাঁহাকে প্রাণ ধারণ করিতে হইয়াছিল। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও মৃত সাধু শ্রদ্ধেয় অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয়দ্বয় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। "প্রকৃত বিশ্বাস" (True faith) নামক পুস্তক এই সময়ে লিখিত হয়।

পর বৎসর তিনি হিন্দুস্থান ও পঞ্জাব অঞ্চলে প্রচারার্থ গমন করেন। তথাকার লোকেরাও তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। পঞ্জাবের তদানীন্তন গবর্ণর ম্যাক্লিয়ড সাহেব তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে একদিন নিজ ভবনে আহারের নিমন্ত্রণ করেন। এ অঞ্চলেও তাঁহার প্রচারের প্রচুর ফল দর্শিয়াছে।

মানুষ কেবল কতকগুলি কার্য্য লইয়া চিরদিন থাকিতে পারে না। উপাসনা যদি হৃদয়ের সম্বল না হয়, তাহা হইলে কেবল শুধু কতকগুলি সৎকার্য্য লইয়া লোকে বাস্তবিক সুখী হইতে পারে না। আত্মার পিপাসা নিবারিত হইতে পারে না। কেবল কার্য্যকে জীবনের সম্বল করিলে সময়ে মনে নিরাশার উদয় হয়। আত্মায় শুষ্কতা আইসে। আত্মপ্রসাদজনিত বিশুদ্ধ সুখ ও প্রশান্ত ভাব যাহা অহরহঃ আত্মাকে সুখী করে, তাহার অভাব হয়। সাধারণ ব্রাহ্মগণেরও এই প্রকার অবস্থা হইয়াছিল। তাঁহারা এতকাল উপাসনা অপেক্ষা কার্য্যকেই অধিক পরিমাণে অবলম্বন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মোপাসনার প্রধান অঙ্গ প্রীতিকে কতক পরিমাণে অনাদর করিয়া দ্বিতীয় অঙ্গ প্রিয়কার্য্যঃ সাধনকেই আত্মার সম্বলরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত হইতে পারিল না। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে দিন দিন তাঁহাদিগের হৃদয় শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। আত্মা আর সেরূপ সজীব থাকিতেছে না। প্রাণ স্ফূর্ত্তি হীন হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িতেছে। সজীবতা উত্তরোত্তর ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। তখন তাঁহারা অত্যন্ত ভীত হইলেন। যাহাতে ইহার প্রতিবিধান হয়, তাঁহার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। উপাসনায়

অমনোযোগই ইহার প্রকৃত কারণ জানিয়া তাঁহারা উপা- সনাকে জীবনের প্রধান সম্বলরূপে অবলম্বন করিলেন।

১৭৮৯ শকের ভাদ্র মাসে কেশব বাবু স্বীয় কলুটোলার বাড়ীতে দৈনিক উপাসনা আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মদিগকে নিরাশাও শুষ্কতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার সূত্রপাত করেন। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে মৃদঙ্গ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। প্রথমে অনেকে ইহাতে নানা আশঙ্কা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে সে আশঙ্কা অমূলক বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। ইহার কিছু দিন পরে কেশব বাবু একবার শান্তিপুরে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি বাঙ্গালা ভাষায় ভক্তি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এই সময় হইতেই ভক্তির দিকে ব্রাহ্মদিগের মন আকৃষ্ট হয়। এই সময় হইতেই ব্রাহ্মগণ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন যে জ্ঞানের সহিত ভক্তির মিলন না হইলে আত্মার বাস্তবিক তৃপ্তি লাভ হইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে হৃদয়ের দেবতাকে অকৃত্রিম প্রীতির অঞ্জলী প্রদান করিতে না পারিলে চরিতার্থতা লাভ করিতে পারা যায় না। প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমিক হইতে হইলে জ্ঞানের সহিত ভক্তিকে উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে হইবে। ভক্তি বিহীন জ্ঞানে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না; প্রাণারাম পরম প্রভুকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারা যাইবে না। যখন তাঁহারা এই

মহান সত্যটী সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা ভক্তি লাভাকাঙ্ক্ষায় লালায়িত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ভক্ত জীবন লাভ করিবার জন্য, হৃদয়ে ভক্তির প্রাণদায়িনী স্রোতস্বতী প্রবাহিত করিবার জন্য, দৃঢ় যত্নপর হইলেন। বলা বাহুল্য যে তাঁহাদিগের চেষ্টা সফল হইয়াছিল।

এই বৎসর কেশব বাবু সাধারণ ব্রাহ্মগণের সহিত মিলিত হইয়া মাঘোৎসব করেন। এই উৎসব উপলক্ষে রাজপথে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হয়। ব্রাহ্মসমাজে সঙ্কীর্ত্তনের দল এই প্রথম রাজপথে বহির্গত হয়। পরে সন্ধ্যাকালে মৃত গোপাল মল্লিকের ভবনে "নবজীবনপ্রদ বিশ্বাস" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। সস্ত্রীক মহাত্মা লর্ড লরেন্স, টেম্পল, মিওর, পাদরী ম্যাক্‌ল্যাউড প্রভৃতি অনেক উচ্চ পদস্থ সম্ভ্রান্ত ইংরেজ বক্তৃতা স্থলে উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহারা সকলেই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।

উৎসবের পর কেশব বাবু কিছু দিন মুঙ্গেরে অবস্থিতি করেন। অনন্তর তথা হইতে তিনি দ্বিতীয়বার বোম্বে অঞ্চলে গমন করেন। এবার তাঁহাকে অর্থের জন্য অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। বোম্বে অঞ্চলে প্রচার করিয়া তিনি পুনরায় মুঙ্গেরে প্রত্যাগত হন এবং

তথায় কয়েক মাস সপরিবারে বাস করেন। এই স্থানে অবস্থানকালীন সাধন ভজনের অত্যন্ত ধূম হইয়াছিল। মুঙ্গের যেন ভক্তি-স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল, পবিত্র ব্রহ্ম নামের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। এই স্থান হইতে কেশব বাবু বিবাহ বিধি বিধিবদ্ধ করিবার জন্য সিমলা গমন করেন। কেশব বাবুর মুঙ্গেরে অবস্থান কালীন কয়েকটী ব্রাহ্ম ভক্তির আতিশয্য নিবন্ধন তাঁহার পদ ধারণ, তাঁহার প্রতি আপত্তি জনক ভাষা প্রয়োগ ইত্যাদি দ্বারা তাঁহাকে অন্যায় ও আপত্তিকর সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এলাহাবাদ উৎসব ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও তাঁহাকে আপত্তিকর ভাষাতে অন্যায় প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনাতে শ্রীযুক্ত বাবু বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত ও ভীত হন। উভয়ে মিলিত হইয়া সংবাদ পত্রে এই সকল অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করেন। এই সকল ঘটনায় কেশব বাবুও যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী ছিলেন তাহা বোধ হয় না। তিনি এই সকল অনুচিত কার্য্যে কখনও কোন প্রকার বাধা দেন নাই। এই জন্যই তাঁহাকে আমরা নির্দ্দোষী বলিতে সক্ষম হইলাম না। এসম্বন্ধে তাঁহার নীরবতা বরং তাঁহার নির্দ্দোষিতার বিপরীত পক্ষই সমর্থন করে।

এই গোলযোগে অনেকগুলী ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করেন। সংবাদ পত্রে এই ঘটনা প্রকাশিত হইলে কেশব বাবু অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ইহাতে তাঁহার কোন দোষ নাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কথা লোকে বিশ্বাস করে নাই।

১৮৬৯ খৃঃঅব্দের ২২শে আগষ্ট ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এই বৎসর শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু, শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন, শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী শ্রীযুক্ত বাবু রজনীনাথ রায় প্রভৃতি অনেকগুলি কৃত বিদ্য লোক ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

১৮৭০ খৃঃঅব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কেশব বাবু ইংলণ্ডে গমন করেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি ইংলণ্ডের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডবাসী অনেকগুলী লোক তাঁহাকে তথায় যাইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই আহ্বান করিতেছিলেন। যথা সময়ে কেশব বাবু লণ্ডন নগরে উপনীত হইলেন। লণ্ডনে উপস্থিত হইবার কয়েক দিন পরে তিনি সার জন বাউয়ারিং, ডাক্তর মার্টিনো ও ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হন। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের যত্নে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য এক সভা আহূত হইয়াছিল। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ ভিন্ন সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণই উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পুরোহিত ডিন্ ষ্ট্যান্লি ও অনেক বিদ্বান এবং সম্ভ্রান্ত লোক সভায় উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা দ্বারা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেশব বাবুও প্রতি বক্তৃতা দ্বারা তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছিলেন। এই দিনকার বক্তৃতাতেই তাঁহার খ্যাতি বাহির হইয়া পড়ে। গ্রাফিক্ পত্রিকায় তাঁহার জীবনী ও প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। কেবল এক মাসের ব্যয়োপযোগী অর্থ তাঁহার সঙ্গে ছিল। ইহার পর তাঁহার যে ব্যয় হইয়াছিল, উক্ত ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায় তাহা বহন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা তাঁহার পরিবারকে পাঁচ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের সম্পাদক রেভারেণ্ড স্পিয়ার্স সাহেব তাঁহাকে নিজবাটীতে লইয়া যান। ইংলণ্ডে এই নিয়ম আছে যে কোন আগন্তুক কোন উপাসনালয়ে উপাসনা করিলে তাঁহাকে একটী কিম্বা ততোধিক স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করা হইয়া থাকে। কেশব বাবু তাহা গ্রহণ করেন নাই। অনন্তর তিনি ডাক্তর মার্টিনোর ভজনালয়ে "ঈশ্বর প্রাণের প্রাণ" বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। এই দিন অনেক বিদ্বান ও সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ এবং রমণীরত্ন মিস্ কব্ উপস্থিত ছিলেন। পরে কন্ওয়েের গির্জ্জায় "অপব্যয়ী পুত্র।" হ্যাক্নী চার্চ্চে "প্রার্থনা" ইস্লিংটনে "ঈশ্বর প্রেম"

এবং একজেটার হলে "সাধারণ শিক্ষা" সম্বন্ধে উপদেশ দেন। শেষোক্ত স্থানে তাঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া জনৈক পাদরী বলিয়াছিলেন যে, "বাস্তবিক সেন মহাশয় আমাদের উচিত যে, আপনার পদতলে বসিয়া কিছু শিক্ষা করি।" ইহার পর মদ্যপান ও যুদ্ধনিবারিণী সভা, দাতব্য সভা, শ্রমজীবী ও অন্ধ বধিরদিগের আশ্রম প্রভৃতি স্থানে তিনি অনেক উপদেশ প্রদান করেন। সেণ্ট জেম্স্ হলে প্রায় পঞ্চ সহস্র শ্রোতার সম্মুখে বৃটীশ রাজের সুরা ব্যবসায়ের প্রতি তীব্র আক্রমণ করিয়া তিনি এক ওজস্বিনী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্পার্জ্জন্স্ টেবার্ণকেলে "ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি ভারতীয় নীচ শ্রেণী ইংরেজদিগের অত্যাচার স্পষ্টরূপে প্রকাশ করেন। ভারতবাসী শ্বেত নবাবগণ তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সভায় মহাত্মা লরেন্স সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। উদার চিত্ত নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ কেশব বাবুর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি "খৃষ্ট ও খৃষ্টধর্ম্ম" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। খৃষ্টধর্ম্মের অনেক গূঢ় তত্ত্ব এই বক্তৃতায় প্রকাশিত হয়। এই বক্তৃতা শুনিয়া পাদরী মহাশয়েরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই বক্তৃতা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া সুইডেনবর্গ সভা তাঁহাকে একখানী অভিন-

ন্দন পত্র ও অনেকগুলী প্রেততত্ত্ব বিষয়ক সুন্দর দৃশ্য গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলেন।

১১ই জুন কেশব বাবু লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া ব্রিষ্টলে গমন করেন। মিস্ কবের ভবনে তিনি অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই স্থানে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের সমাধি মন্দির দর্শন করিতে গমন করিয়া সমাধি স্থানে জানু পাতিয়া রাজার পরলোকগত আত্মার মঙ্গল উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিয়া আপনার নাম লিখিয়া আইসেন। অনন্তর মহাকবি সেক্সপিয়ারের জন্ম স্থান ষ্ট্র্যার্টফোর্ড, পরে লিচেষ্টার, বর্ম্মিংহাম ও নটিংহাম গমন করেন। শেষোক্ত স্থানে ৪০ জন পাদ্‌রীর স্বাক্ষরিত এক পত্র তাঁহার হস্তগত হয়। পত্রের মর্ম্ম—খৃষ্টান না হইলে পরিত্রাণ নাই। তুমি খৃষ্টান হইবে কি না? "আপনাদিগের মতানুসারে আমি খ্রীষ্টান হইব না। তবে যীশুর প্রেম, ভক্তি ও আত্মত্যাগ আমার প্রার্থনীয়।" পত্রের তিনি এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে তিনি মান্‌চেষ্টারে গমন করেন। এই সময়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম নিবন্ধন তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন। পীড়িতাবস্থায় তিনি রেভারেণ্ড হার্ডফোর্ড ব্রুকের গৃহে অবস্থিতি করেন। ব্রুকের পত্নী জননীর ন্যায় যত্ন করিয়াছিলেন। পীড়িত অবস্থাতেই তিনি লিভারপুল গিয়া

বক্তৃতা করেন। অনন্তর পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়াতে দুই সপ্তাহের জন্য কার্য্য বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। লিভারপুলে তিনি ডবারণ সাহেবের বাটীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কেশব বাবুর আমেরিকা গমনের অভি-লাষ ছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ ও চিকিৎসক-গণের নিষেধে তিনি তথায় গমন করিতে পারেন নাই। স্বাস্থ্য লাভ করিয়া তিনি লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন। তথাকার প্রধান প্রধান সভাতে তাঁহার বক্তৃতা হইল। অতঃপর তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া এডিনবরা, গ্লাস্‌গো, লিড্‌স্‌ প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। অক্স-ফোর্ড নগরে পণ্ডিতবর মোক্ষ মূলারের সহিত সাক্ষাৎ হয়। পণ্ডিতবর তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ ভবনে লইয়া গিয়াছিলেন। পরে ধার্ম্মিকবর ডাক্তার পিউজী, জন ষ্টুয়ার্ট মিল, নিউম্যান, কাউয়েল প্রভৃতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। অস্‌বরণ নামক রাজপ্রাসাদে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। রাজকন্যা লুই মাতার সমভিব্যাহারিণী ছিলেন। মহারাণী কেশব বাবুকে নিজের একখানি প্রতিমূর্ত্তি ও তাঁহার স্বামীর দুইখানি জীবনী উপহার প্রদান করেন। এই সময়ে রাজকুমার লিওপোল্ড কেশব বাবুর হস্তাক্ষর চাহিয়া লন। মহারাণী স্বামীর যে জীবনী দুইখানি

কেশব বাবুকে উপহার দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার হস্তাক্ষর সংযুক্ত ছিল। কেশব বাবুও মহারাণীকে পত্নীর প্রতিমূর্ত্তি উপহার দিয়াছিলেন। অনন্তর কেশব বাবু স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য ১২ই সেপ্টেম্বর হানোবর স্কোয়ার রুমে এক সভা হয়। এই সভায় রেভারেণ্ড স্পিয়ার্স বক্তা ছিলেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর তিনি জাহাজে আরোহণ করেন। অনেক বন্ধু তাঁহার সঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। স্থানীয় লোকের অনুরোধে এই স্থানে তাঁহাকে কিছু বলিতে হইয়াছিল। ইংলণ্ডে অবস্থানকালীন মহারাণী ভিক্টোরিয়া, গ্লাডষ্টোন, ডিন ষ্ট্যান্‌লী এবং আরও অনেক সম্ভ্রান্ত লোক কর্ত্তৃক তিনি আহারের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ১৮৭০ খ্রীঃঅব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ইংলণ্ডে গমন করিয়া ছয় মাস কাল তথায় অবস্থান পূর্ব্বক ঈশ্বরের নাম ঘোষণা করিয়া এবং স্বীয় মোহিনী বক্তৃতা শক্তিতে তদ্দেশবাসীদিগকে মুগ্ধ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন। কেশব বাবুর ইংলণ্ড গমনে তথাকার অনেক প্রধান লোকের মন ভারতের দিকে আকৃষ্ট হয়। তিনি সেখানে অতি উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডবাসীগণ তাঁহাকে অনেক অর্থ, গ্রন্থ, অলঙ্কার ও শিল্প-দ্রব্য উপ-

হার প্রদান করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডবাসীগণ যদি তাঁহাকে অর্থ সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার তদ্দেশে অবস্থান করিয়া ঈশ্বরের নাম ঘোষণা করা ও স্বদেশে প্রত্যাগমন করা অত্যন্ত কষ্টকর হইত। তিনি যখন ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতা টাউনহলে এক সভা আহ্বান করিয়া—"ভারতের সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধ" শীর্ষক এক বক্তৃতা প্রদান করিয়া ইংলণ্ড গমনোপযোগী ব্যয়ের জন্য অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাহাতে [illegible] শত টাকার অধিক সংগৃহীত হয় নাই। ইংলণ্ড গমনের ব্যয়ের জন্য ইহা অতি সামান্য। ১৬ই অক্টোবর তিনি বোম্বে ও ২০শে অক্টোবর হাওড়া ষ্টেশনে উপনীত হন। তাঁহার জন্য গঙ্গায় স্বতন্ত্র ষ্টিমার নিযুক্ত রাখা হইয়াছিল। বাষ্পীয় শকট হইতে নামিয়া বন্ধু বান্ধবগণের প্রিয় সম্ভাষণ ও সস্নেহ আলিঙ্গন দ্বারা সাদরে গৃহীত হইয়া দীর্ঘকালের পর পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইলেন। কিছুদিন ইংলণ্ড সম্বন্ধীয় আলাপাদি চলিতে লাগিল। কেশব বাবুর ইংলণ্ড পরিত্যাগের পর তথায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বে তথায় ব্রাহ্মসমাজ ছিল না।

ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কেশব বাবু দেশস্থ প্রধান প্রধান লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আরম্ভ

করেন। তাহাতে প্রধান প্রধান লোকদিগের ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি যে বিদ্বেষ ভাব ছিল, তাহা অনেক পরিমাণে অপনীত হয়।

১৮৭০ খৃঃঅব্দের ২রা নবেম্বর কেশব বাবুর প্রযত্নে ভারত সংস্কারক সভা স্থাপিত হয়। এই সভা পাঁচ ভাগে বিভক্ত। সুলভ সাহিত্য বিভাগ, দাতব্য বিভাগ, শ্রমজীবীদিগের শিক্ষা বিভাগ, স্ত্রী বিদ্যালয় বিভাগ ও সুরাপান নিবারিণী বিভাগ। সুলভ সমাচার নামক এক পয়সা মূল্যের একখানি সংবাদ পত্র এই সভা হইতে প্রচারিত হয়। সুলভ সমাচার দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছে। স্ত্রী বিদ্যালয়ে বয়স্থা মহিলাগণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন। সুরাপান নিবারিণী বিভাগ হইতে "মদ না গরল" নামক একখানি পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হইত। ১৮৭১ খ্রীঃঅব্দের ১লা জানুয়ারি "ইণ্ডিয়ান মিরার" সংবাদ পত্র দৈনিক হয়। এই সময়ে দেবেন্দ্র বাবুর সহিত কেশব বাবুর ও সাধারণ ব্রাহ্মগণের মিলন হইবার প্রস্তাব হয়; কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ইহার পর ভারত আশ্রম সংস্থাপিত হয়। নানা কারণে, বিশেষতঃ কর্ম্মচারী গণের অন্যায় আচরণে চারি পাঁচ বৎসর ভিন্ন ইহা জীবিত থাকিতে পারে নাই। এই আশ্রম লইয়া অত্যন্ত আন্দোলন হইয়াছিল।

বিচারালয়ে অভিযোগ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। এই সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মগণ কেশব বাবুর অযথাকর্তৃত্বে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠেন। যাহাতে সাধারণ তন্ত্র মতে সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহার জন্য তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হইতে পারে নাই। কতকগুলি স্বাধীন-চিন্তা-শক্তি-বিহীন লোক কেশব বাবুর পক্ষ সমর্থন করাতে তাঁহাদের ধর্ম্ম সঙ্গত ন্যায়ানুমোদিত চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। কোচবিহার বিবাহের পর কেশব বাবু যে প্রত্যাদিষ্ট প্রেরিত মহাপুরুষ হইয়া বসিয়াছিলেন, এই স্থান হইতে তাহার সূত্রপাত হয়। এই সময়ে মহিলাদিগকে যবনিকার বাহিরে উপবেশন করা লইয়া অত্যন্ত গোলযোগ হয়। এই গোলযোগে কেশব বাবুকে পরাস্ত হইতে হইয়াছিল। কেশব বাবু মহিলাদিগের যবনিকার বাহিরে উপবেশন করার বিপক্ষে ছিলেন।

কেশব বাবু ব্রাহ্মসমাজে সাধারণ তন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সমস্ত কর্তৃত্ব নিজ হস্তে রাখিয়াছিলেন। সাধারণ সভার অবস্থা বড় ভাল ছিল না। মাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্বে জেলার এডুকেশন কমিটী ইত্যাদির অবস্থা যেরূপ হইয়া থাকে, এই সভার অবস্থাও অনেক অংশে তদনুরূপ ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে সভার স্বাধীনতা

অতি অল্পই ছিল। ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কুচবিহার বিবাহের পর সমাজের আচার্য্য ও সম্পাদক পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব। এই হইতেই অধিকাংশ ব্রাহ্ম কেশব বাবুর অযথা প্রভুত্বে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন ও ভবিষ্যতে যে দুইটী স্বতন্ত্র দলের সৃষ্টি হইবে, তাহার সূত্রপাত আরম্ভ হয়। বাস্তবিক কেশব বাবুর অযথা প্রভুত্বের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সময়ে বিবাহ বিধি বিধিবদ্ধ হয়। ইহা লইয়া আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহিত প্রায় চারি বৎসর কাল বিবাদ হয়।

১৭৯৪ শকের শেষভাগে কেশব বাবু কতকগুলি ব্রত গ্রহণ করেন। সেই ব্রতগুলী স্বপাক ভোজন, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে কুটীরে বাস ইত্যাদি। এ গুলি দ্বারা যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি উপকার হয়, তাহা আমরা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে হৃদয়ঙ্গম করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। মাতা পত্নি বা অন্য কোন আত্মীয়ের প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিলে ধর্ম্ম হয় না, স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করিলে অধিক পরিমাণে ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হয়, ইহার কোন অর্থ নাই। এই ব্যাপারকে আমাদের নিকট ধর্ম্মের ভেক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার স্বপাক ভোজন ব্রত অবলম্বনের ফল ১৭৯৫ শকে ফলিল। তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন! তখন ব্রত ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইলেন।

১৭৯৮ শকের ৫ই বৈশাখ কেশব বাবুর বিশেষ যত্নে "এলবার্ট হাল" নামক অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। অনন্তর তিনি ৮ই জ্যৈষ্ঠ মোড়পুকুর গ্রামে "সাধনকানন" উদ্যান স্থাপন করেন। এখানে ব্রাহ্মগণ সাধন ভজন করিতেন। এই বৎসর ফাল্গুন মাসে গবর্ণর জেনারেল লর্ড লিটন বাহাদুরের অনুরোধে তিনি টাউন হলে "ধর্ম্মে বিজ্ঞান ও উন্মত্ততা।" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। ১৭৯৯ শকের আশ্বিন মাসে সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলীর উত্তেজনায় কেশব বাবু প্রতিনিধি সভা স্থাপন করেন। এই সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে চিরঞ্জীব শর্ম্মা হস্তোত্তলন বাদী বলিয়া উপহাসের চক্ষে একটু কুটীল কটাক্ষ করিয়াছেন।

এই বৎসর মান্দ্রাজ অঞ্চলে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হয়। সে জন্য কেশব বাবু যত্ন করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দিরে এক সভা করেন। সেই সভায় অনেক টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল এবং উপযুক্ত কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছিল। এই বৎসরের ২৮শে কার্ত্তিক কেশব বাবু তাঁহার কলুটোলার বাস ভবন পরিত্যাগ করিয়া কমল কুটীরে আসিয়া বাস করেন। এই বাড়ী ক্রয় করা লইয়া অত্যন্ত গোলযোগ হইয়ছিল। উড়িষ্যা দেশ জাত কোন বঙ্গীয় যুবক আপনার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া প্রায় বিংশতি সহস্র মুদ্রা কেশব বাবুর হস্তে অর্পণ করিয়া বলেন যে, আপনি এই টাকা

কোন সৎকার্য্যে ব্যয় করুন। কেশব বাবু কমল-কুটীর ক্রয় করিয়ার সময় এই টাকা ব্যয় করেন্। সেই যুবক এই কথা জানিতে পারিয়া হঠাৎ কেশব বাবুর নিকট টাকা চাহেন। কেশব বাবু তৎক্ষণাৎ টাকা প্রদান করিতে অক্ষম হওয়াতে সেই যুবক অভিযোগ করিবার জন্য হাইকোর্টে গমন করেন। কিন্তু অভিযোগ হয় নাই। কেশব বাবু টাকা পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলেন।

ইহার পর যে ভয়ংকর বাত্যা ব্রাহ্ম সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ইহাকে ভয়ানক আন্দোলিত শ্রীভ্রষ্ঠ ও ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াছে, পর পরিচ্ছেদে আমরা সেই বিষয়ের অবত্তারণা করিত্তে চলিলাম। সেই ভয়ংকর বাত্যা কোচবিহার বিবাহ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদেই আমরা বলিয়াছি যে আমরা এই পরিচ্ছেদে এমন একটী বিষয়ের অবতারণা করিতে যাইতেছি যাহা দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজ সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ও যার পর নাই অনিষ্ট হইয়াছে। যদি কতকগুলি স্বাধীনচেতা ধর্ম্ম-বীর এই সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মকে অসত্যের হস্ত হইতে উদ্ধার না করিতেন, তাহা হইলে

প্রাণপ্রতিম ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও প্রিয়তম ব্রাহ্ম সমাজের যে কি ঘোর দুর্দ্দশা হইত, তাহা ভাবিলেও শরীর কণ্টকিত হয়; হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কোচবিহার বিবাহের পর হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ আর ব্রাহ্মসমাজ নাই, এবং তাহার উপাসকগণও আর ব্রাহ্মপদ বাচ্য নহেন। কোচবিহার বিবাহের পর হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। নববিধান নামে এক নূতন ধর্ম্ম তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। এই নববিধান ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনেক প্রভেদ। যে সকল সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ, তাহার সহিত কতকগুলি ভ্রমাত্মক মত ও ক্রিয়া মিশ্রিত হইয়া ইহার জন্ম হইয়াছে। সেই সকল ক্রিয়া হোম, নিশান ও ধর্ম্মগ্রন্থ আরতি করা, জর্ডনের জল দ্বারা খৃষ্ট যেরূপ অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তদনুরূপ কমল সরোবরের জল দ্বারা অভিষিক্ত হওয়া ইত্যাদি। ইহা ভিন্ন কতকগুলি ভেক যাহা সাম্প্রদায়িকতার সহচর, যেমন গৈরিক বস্ত্র পরিধান, করঙ্গ গ্রহণ করিয়া ভিক্ষা করা ইত্যাদি এই ধর্ম্মে স্থান লাভ করিয়াছে। মধ্যবর্ত্তী বাদ, বিশেষ বিধান প্রভৃতি ভ্রমাত্মক মত সকলও এই নব ধর্ম্মের অঙ্গ পুষ্টি করিয়াছে। যদিও এই ধর্ম্মাবলম্বীগণ মুখে বলিয়া থাকেন যে, আমরা মধ্যবর্ত্তী স্বীকার করি না, কিন্তু কার্য্যতঃ

তাহা ঠিক নহে। বাস্তবিক তাঁহারা মধ্যবর্ত্তী স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সেই মধ্যবর্ত্তী মৃত মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন। ঈশ্বর যুগে যুগে পৃথিবীতে বিশেষ শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ প্রেরণ করেন, ইহাও নববিধানের একটী মত। এই মতটী বিশেষ বিধান নামে অভিহিত। কোচ-বিহার বিবাহের পর কেশব বাবু স্বয়ংই বলিয়াছিলেন যে "বর্ত্তমান সময়ে আমার ভিতর দিয়া ভিন্ন কোন সত্য প্রত্যক্ষ ভাবে কাহারও নিকট প্রকাশিত হইবে না।" আর মধ্যবর্ত্তীর অবশিষ্ট কি থাকিল? বাস্তবিক নববিধান ধর্ম্ম যে প্রকার ও তদবলম্বীগণ যে সকল মতে বিশ্বাস করেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে ব্রাহ্ম নামে অভিহিত করা যায় না, এবং তাঁহাদিগের সমাজকে ব্রাহ্ম সমাজ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যদি তাঁহাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করা যায় ও তাঁহাদিগের সমাজকে ব্রাহ্ম সমাজ নামে অভিহিত করা যায়, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজকে ব্রাহ্ম সমাজ ও তদন্তর্গত ব্রাহ্মদিগকে অন্য আখ্যা প্রদান করিতে হয়। নববিধান ধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মকে হত্যা করা হয়।

কথার প্রসঙ্গে আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে মূল বিষয়ের অবতারণায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। কেশব বাবুর যত্নে ইতিপূর্ব্বে যে বিবাহ বিধি বিধিবদ্ধ

হইয়াছিল। তাহাতে নির্দ্ধারিত হয় যে কন্যার বয়স ন্যূন-কল্পে চতুর্দ্দশ বৎসর ও পাত্রের বয়স ন্যূনকল্পে অষ্টাদশ বৎসর না হইলে পরিণয় হইতে পারিবে না। ব্রাহ্ম মাত্রেরই এই বিধি প্রতিপালন করা উচিত, যে বিবাহে এই বিধির ব্যভিচার হইবে, তাহা ব্রাহ্ম বিবাহ নহে এবং ব্রাহ্মদিগের তদনুরূপ কোন বিবাহে যোগ প্রদান করা উচিত নহে, আর ব্রাহ্ম বিবাহ পৌত্তলিকতা দোষ স্পর্শশূন্য হইবে, কোনরূপ পৌত্তলিক অনুষ্ঠান তাহাতে স্থান লাভ করিতে পারিবে না, ইহাও তিনি প্রাণের সহিত অনুমোদন করিতেন; এবং পৌত্তলিক অনুষ্ঠান যুক্ত বিবাহকে তিনি কদাচ ব্রাহ্ম বিবাহ নামে অভিহিত করিতেন না। * কিন্তু কোচবিহারের রাজার সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দেওয়াতে এ উভয় বিধিই সম্পূর্ণরূপে ভঙ্গ

* শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাচরণ খাস্তগির মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল গুপ্ত মহাশয়ের বিবাহ হয়। এই বিবাহে পৌত্তলিক সংস্রব ছিল। সেই জন্য কেশব বাবু উক্ত বিবাহ লইয়া অত্যন্ত আন্দোলন উপস্থিত করেন। যে জন্য তিনি অন্নদা বাবুর কন্যার বিবাহের প্রতিবাদ করিলেন, বিবাহ লইয়া আন্দোলন করিলেন, ব্রাহ্ম বিবাহ নহে কিন্তু পৌত্তলিক দোষ দুষ্ট বিবাহ বলিয়া গোলযোগ করিলেন, আপনি সেই প্রকার অথবা তাহা অপেক্ষা অধিক পৌত্ত-লিক সংস্রব যুক্ত ও বাল্য বিবাহে লিপ্ত হইয়া অম্লানবদনে, ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। নিজের দোষ ঈশ্বরের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি তিনি আদেশের দোহাই দিয়া, ঈশ্বরকে অসত্য সমর্থনকারী রূপে প্রতিপন্ন করিয়া বিবাহ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। যখনই কোচবিহারের রাজার সহিত তাঁহার কন্যার সম্বন্ধ আসিল, তখনই তিনি ইহাকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া মনে করিলেন। কাহাকে কোন কথা না বলিয়া, জিজ্ঞাসা না করিয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব প্রমুখ ২৩ জন ব্রাহ্ম কেশব বাবুকে এই বিবাহ সম্বন্ধে এক পত্র লেখেন। কেশব বাবু সেই পত্র পাঠ করা পাপ মনে করিয়া তাহা পাঠে বিরত হন। আরও অনেক প্রতিবাদ পত্র তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কাহারও কথা শ্রবণ করেন নাই। আদেশের দোহাই দিয়া সকলের কথা উপেক্ষা করিয়া বিবাহে প্রবৃত্ত হন। সম্বন্ধ স্থির হইবার পূর্ব্বে কেশব বাবু বর পক্ষের নিকট এই কয়েকটী প্রস্তাব করেন। প্রথম, রাজা ব্রাহ্ম কিম্বা একেশ্বরবাদী বলিয়া লিখিয়া দিবেন। দ্বিতীয়, ব্রাহ্ম সমাজের পদ্ধতি অর্থাৎ অপৌত্তলিক হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইবে। তৃতীয় পাত্র পাত্রী উপযুক্ত বয়সে বিবাহিত হইবেন; এক্ষণে কেবল বাগ্দান মাত্র হইবে। চতুর্থ, বিবাহ পদ্ধতিতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নিয়ম প্রতিপালিত হইবে। বাগ্দান কথাটী ব্যবহৃত হইল কেন? কেসব বাবু ত৹

কন্যাকে বাগ্দান করিবার সম্বন্ধ স্থির করেন নাই। বিবাহ দিবার সম্বন্ধই স্থির করিয়াছিলেন। তবে এ চতুরতা কেন? তাঁহার অনুগামীগণ ইহাকে বাগ্দান বলিয়া আপনাদিগের বিবেককে প্রবোধ দিতে পারেন, কিন্তু অন্যের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এইরূপে বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলে পাত্র পাত্রী পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ হইল। কেশব বাবু তাঁহাদিগকে লইয়া প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর নিম্নলিখিত প্রস্তাব কয়েকটী লইয়া রাজপক্ষীয় লোক কোচবিহার গমন করিল। প্রথম বিহারের পূর্ব্বে বা পরে পাত্র পাত্রীর সহিত কোন পৌত্তলিক সংস্রব থাকিতে পারিবে না। দ্বিতীয় বিবাহ মণ্ডপে মূর্ত্তি, ঘট বা অগ্নি রক্ষিত হইবে না। তৃতীয় কোন মন্ত্র পরিত্যক্ত বা পরিবর্ত্তিত হইবে না। অনন্তর কেশব বাবু তারযোগে কোচবিহার সংবাদ দিলেন যে "ধর্ম্ম-বিষয়ে বিন্দুমাত্রও এদিক ওদিক হইবে না।" উত্তর আসিল যে, "কোন আশঙ্কা নাই।" তাহার পর কেশব বাবু যখন কোচবিহার গমনে উদ্যত হইলেন, তখন সংবাদ আসিল "বিবাহ পদ্ধতি দেখা হয় নাই এবং উহা মুদ্রিত হইবে না।" কয়েক দিন পরে আবার সংবাদ আসিল যে ব্রাহ্ম পদ্ধতি মন্ত্রের মধ্যে নিবিষ্ট আছে, সুতরাং উহা ব্যবহৃত হইতে পারে না।

তখন কেশব বাবুর গমনোপযোগী স্পেশেয়াল ট্রেণ প্রস্তুত হইয়াছে। কেশব বাবু বলিলেন, স্পেশেয়াল ট্রেণ বন্ধ থাকুক। বর-পক্ষীয়েরা বলিলেন, তাহা হইতে পারে না। তখন কেশব বাবু সপরিবারে কোচবিহার যাত্রা করিলেন। এই স্থানে আমরা বলিতে বাধ্য হইলাম যে এই বিবাহ আদেশ মূলক নহে। ধর্ম্ম-বুদ্ধির উত্তেজনায় যদি কেশব বাবু এই বিবাহ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে তিনি যখন দেখিলেন বিবাহে তাঁহার প্রাণসম ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র নিয়ম প্রতিপালিত হইবে না, তখন তিনি কদাচ সপরিবারে কোচবিহারে কন্যা বিবাহ দিতে যাইতে পারিতেন না। স্পেশেয়াল ট্রেণ ত সামান্য কথা, প্রাণ গেলেও তিনি কদাচ ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না।

কেশব বাবু সপরিবারে কোচবিহারে উপস্থিত হইলে বর-পক্ষীয়েরা প্রস্তাব করিলেন যে কেশব বাবু বিবাহ মণ্ডপে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। কেননা ইংলণ্ড গমনে তিনি জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন। উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ মন্ত্র পড়িতে পারিবে না। ব্রহ্মো-পাসনা হইবে না। পাত্র পাত্রী অঙ্গীকার করিবে না। হোম হইবে। কেশব বাবু এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। কিন্তু অসম্মত হইয়া আর কি করিবেন। অধি-

বাসের জন্য বর-পক্ষীয়েরা কন্যাকে রাজবাটীতে লইয়া গেল ও যথারীতি অধিবাস হইয়া গেল।

পরে বিবাহ দিবসে হোম হইবে কি না, এই বিষয়ে বাদানুবাদ হয়। বাদানুবাদের পর স্থির হয় যে কন্যা-পক্ষীয় কেহ পৌত্তলিকতায় যোগ দিবেন না। অনন্তর বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদিত হইল। বিবাহে বর-পক্ষীয়-দিগের নিয়মাদিই কার্য্যে পরিণত হইল। বিবাহ স্থানে হরগৌরী আনয়ন করা হইয়াছিল ও হোম করা হইয়া-ছিল। বিবাহের পর পাত্র পাত্রীকে অঙ্গীকার পাঠ ও প্রার্থনা করান হইয়াছিল। কিন্তু বলা বাহুল্য যে এ বিবাহে তাহার মূল্য ও কার্য্য-কারীতা কিছুই নহে। এইরূপে কেশব বাবু কন্যার বিবাহ দিয়া দুহিতাকে রাজরাণী করিয়া এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের মস্তকে কুঠরাঘাত করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলেন। এই সময়ে সাধারণ ব্রাহ্ম মণ্ডলী তিনি পৌত্তলিকমতে অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, এই জন্য তাঁহাকে বেদীচ্যুত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু অনেকগুলি স্বাধীন চিন্তা-শক্তি বিহীন লোক তাঁহার পক্ষ সমর্থন করাতে ও উপাসনা মন্দির উপযুক্ত ট্রষ্টীর হস্তে ন্যস্ত না করিয়া আপনার নামে রাখাতে সাধারণ ব্রাহ্ম মণ্ডলী তাঁহাদিগের সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে

পারিলেন না। কেশব বাবু অনায়াসে মন্দির হস্তগত করিয়া তাহাতে আপন আধিপত্য বিস্তার করিলেন। তখন সাধারণ ব্রাহ্মগণকে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। সাধারণের অর্থ দ্বারা নির্ম্মিত মন্দির স্বীয় নামে রাখা, উপযুক্ত ট্রষ্টীর হস্তে অর্পণ না করা, কেশব বাবুর আর একটী অন্যায় কার্য্য। ইহার মধ্যে যে তাঁহার কোন অভিপ্রায় ছিল না, আমাদের তাহা বিশ্বাস হয় না। শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে এক্ষণে এই মন্দিরের ট্রষ্টী নিয়োগ করা লইয়া যে কি কষ্ট পাইতে হইতেছে, তাহা সাধারণের অবিদিত নাই। অনন্তর সাধারণ ব্রাহ্মগণ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তন ইত্যাদির জন্য সম্পাদককে সভা আহ্বান করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সম্পাদক সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। সভা আহূত হয় নাই। পরে ট্রষ্টী নিয়োগ করিবার জন্যও সম্পাদককে সভা আহ্বান করিতে বলা হইয়াছিল, সে অনুরোধও তিনি প্রতিপালন করেন নাই।

কোচবিহার বিবাহকে আদেশ মূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে গিয়া ও আদেশের স্কন্ধে সমস্ত দোষ চাপাইয়া কেশব বাবুকে নির্দ্দোষী করিতে যাইয়া, তাঁহার জীবনী

লেখক মহাত্মা চিরঞ্জীব শর্ম্মা অনেক নূতন ও রহস্য-জনক কথা বলিয়াছেন। তাঁহার এক কথা "তেজিয়সাং ন দোষায়।" এই বিবাহে তাহাই হইয়াছে। অর্থাৎ কেশব বাবু প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ বা অবতার, সুতরাং তিনি তেজিয়ান। তাঁহার পক্ষে এ কার্য্য অকর্ত্তব্য বা নিন্দনীয় নহে। বৈষ্ণবেরাও কিন্তু এই তেজিয়সাং ন দোষায়" বচনের দোহাই দিয়া তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণের ব্যভিচার সমর্থন করিয়া থাকেন। তাঁহার আর এক কথা এই যে পৃথিবীর প্রচলিত নীতি শাস্ত্র অনেক সময় তাঁহার (কেশব বাবুর) পরিচালক ছিল না। পৃথিবীর নীতি শাস্ত্র কি ঈশ্বরাদেশের বিরোধী? যে নীতি শাস্ত্র পৃথিবীতে প্রচলিত হইয়া জন সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহা কি ঈশ্বরের নীতি শাস্ত্র নহে? শয়তান কি ইহার প্রচার কর্ত্তা? যদি ইহা ঈশ্বর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, শয়তান যদি ইহার প্রতিষ্ঠাতা না হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের আদেশের সহিত ইহার কোন প্রকার অমিল বা বিরোধ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেশব বাবু আদেশ অনুসারে চলিতেন, সুতরাং পৃথিবীর নীতি শাস্ত্র অনেক সময় তাঁহার পরি-চালক হইতে পারিত না, ইহা দ্বারা এই প্রতীত হয় যে ঈশ্বরের আদেশে ও নীতিতে সামঞ্জস্য নাই। কিন্তু

আমরা এ কথা মানিতে পারি না। যেখানে স্বার্থ-পরতা আদেশের আবরণে আবৃত হইয়া উপস্থিত হয়, সেইখানেই নীতি ও ঈশ্বরাদেশে অনৈক্য ও অসামঞ্জস্য হইয়া উঠে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে এ বিবাহ যে সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মসমাজের প্রণালী অনুসারে হইবে না, তাহা তিনি জানিতেন।” তিনি ব্রাহ্ম হইয়া জানিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রণালী পদদলিত করিয়া কেমন করিয়া এই বিবাহে প্রবৃত্ত হইলেন? তিনি এই-রূপ অনেক প্রকার অযৌক্তিক ও প্রলাপ বাক্য এবং রহস্যজনক যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। বিস্তৃতি ভয়ে আমরা তাঁহার সমস্ত কথা তুলিলাম না, যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি মূল পুস্তক পাঠ করিয়া অবগত হইবেন।

এইরূপে যখন সাধারণ ব্রাহ্মগণ কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তন, ট্রষ্টী নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইলেন, কেশব বাবু অন্যায়রূপে মন্দির ও বেদী হস্তগত করিলেন ও বলপূর্ব্বক স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেন, তখন তাঁহারা স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য হইলেন। এই রূপে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ জন্ম গ্রহণ করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় “সাধারণ” নামটী নির্ব্বাচন করিয়া দেন। কেশব বাবু এই সমাজের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে বরাবর সন্দিহান ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে এই

সমাজে প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস প্রভৃতির সম্পূর্ণ অভাব। সুতরাং ইহার স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা কোথায়? তিনি এই সমাজের ব্রাহ্মদিগকে বৌদ্ধ-ব্রাহ্ম বলিতেন। সাধারণ ব্রাহ্ম মণ্ডলী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া গেলে, কেশব বাবুর মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। সেই নিদারুণ মনোবেদনায় তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। এই মর্ম্মান্তিক আঘাৎ কিছুতেই তিনি সংবরণ করিতে সক্ষম হন নাই। এই যে তাঁহার শরীরে রোগ প্রবেশ করিল, তাহা আর সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য হইল না। সেই রোগই তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। এই রোগের প্রথম আক্রমণে তাঁহাকে শয্যাশায়ী হইতে হইয়াছিল।

কেশব বাবু রোগের হস্ত হইতে আপাতমুক্ত হইয়া কতকগুলি কার্য্যের সুত্রপাত করেন। ১৮০০ শকে শারদীয় পূর্ণিমার দিবস নৌকা ও বাষ্পীয়পোতে শারদীয় উৎসব সম্পন্ন করেন। গঙ্গা বক্ষে সংকীর্ত্তন ও গঙ্গাকে অর্চ্চনা করা হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। কেশব বাবুর সহিত তাঁহার অত্যন্ত সৌহৃদ্য ছিল। কেশব বাবুর অনুচরগণ এই গঙ্গা পূজাকে কবিত্ব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহাকে যদি কবিত্ব বলিয়া দোষ শূন্য বলিতে হয়, তাহা

হইলে হিন্দুদিগের দুর্গোৎসবাদি সমস্ত অনুষ্ঠান যাহা পৌত্ত-লিক অনুষ্ঠান নামে অভিহিত হয়, সেই সমস্তগুলিকেও কবিত্বের চক্ষে দৃষ্টি করিলে দোষশূন্য হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং তাঁহাদের মতে ব্রাহ্মদিগের এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা বোধ হয় দোষাবহ নহে। অনন্তর কেশব বাবু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি চটি পুস্তক প্রণয়ণ করিয়া রেল-ওয়ে ষ্টেসনে বিতরণ করেন। সাম্বৎসরিক উৎসব সময়ে তিনি "আমি কি প্রত্যাদিষ্ট প্রেরিত মহাপুরুষ।" সম্বন্ধে টাউন হলে এক বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি যে একজন অসাধারণ লোক তাহা, তিনি স্বয়ংই প্রকাশ করেন।তিনি তাঁহার নিজের অসাধারণত্ব সপ্রমাণ করি-বার জন্য চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের সময় আমিষ পরিত্যাগের কথা প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছিলেন।

অতঃপর কেশব বাবুর যত্নে প্রচারকদিগের বাসের জন্য মঙ্গল বাড়ী নামে কতকগুলি বাড়ী প্রস্তুত হয়। প্রত্যেক প্রচারকের এক একখানি বাড়ী হয়। এতদিন তাঁহাদের থাকিবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না। এত-দিনে সে অভাব পূর্ণ হইল।

এই বৎসর কেশব বাবু টাউন হলে "খৃষ্ট কে?" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। নারী জাতিকে জ্ঞান ধর্ম্ম ও গৃহকার্য্যে সুশিক্ষিতা করিবার জন্য আর্য্য নারীসমাজ

সংস্থাপিত করেন। ১৮০১ শকের ভাদ্র মাসে তিনি কয়েকজন প্রচারককে বিশেষ বিশেষ কার্য্যভার অর্পণ করেন। শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে খৃষ্টীয় শাস্ত্র, শ্রীযুক্ত বাবু গৌর গোবিন্দ রায় মহাশয়কে হিন্দু-শাস্ত্র, শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়কে মুসলমান শাস্ত্র শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয়কে বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুশীলনের ভার এবং শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল মহাশয়কে সঙ্গীতের ভার দেওয়া হয়। কার্ত্তিক মাসে কেশব বাবু স্বদলে প্রচার যাত্রায় বহির্গত হন। এই সময় হইতে তাঁহার হিন্দু আচার ব্যবহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিপতিত হয়। এজন্য অনেকে তাঁহাকে হিন্দু বলিত। তাঁহার ধর্ম্মকে দরবেশের কাঁথা, ঘাসিদাসের চাণাচুর বলিত। ইহা শুনিয়া তিনি হাসিতেন। এই সময় হইতে তাঁহাদের মধ্যে গৈরিক বস্ত্রের অধিক পরিমাণে প্রচলন আরম্ভ হয়। এক তন্ত্রী ও এই সময় হইতেই প্রবেশ করে।

১৮০১ শকের ১২ই মাঘ মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন নব বিধান ধর্ম্ম প্রচার করেন, নববিধান ধর্ম্ম কি, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে এক প্রকার বিবৃত করিয়াছি। সুতরাং এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেশব বাবুর জীবনী লেখক শ্রদ্ধাস্পদ চিরঞ্জীব শর্ম্মা বলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মই নব-বিধান ধর্ম্ম। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যে নব-বিধান ধর্ম্ম নহে, উহার

সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের যে অনেক প্রভেদ, তাহাও আমরা ইতি-পূর্ব্বে এক প্রকার বলিয়াছি। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম উদার বিশ্ব জনীন সত্য ধর্ম্ম নব-বিধান তাহা নহে। কিন্তু চিরঞ্জীব শর্ম্মা একথা স্বীকার না করিয়া বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মই নব-বিধান। ব্রাহ্মধর্ম্ম শব্দটী ঐশী শক্তির প্রতিশব্দ নহে বলিয়া কেশব বাবু নববিধান নামে অভিহিত করেন। আমরা কিন্তু তাহা বলি না। আমরা বলি কোচবিহার বিবাহ সমর্থন করিবার জন্য তিনি তাঁহার এই মনগড়া নব-বিধানের সৃষ্টি করেন। বাস্তবিক নব-বিধান ধর্ম্ম যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি জন সমাজের প্রচলিত ধর্ম্ম সমূহও ব্রাহ্মধর্ম্ম। কিন্তু কোন ব্রাহ্ম একথা স্বীকার করিতে পারেন কি ?

নববিধানের প্রথম বর্ষে কেশব বাবু নিশান পূজা হোম, জল সংস্কার, খৃষ্টের রক্ত মাংস ভোজন, মস্তক মুণ্ডন, ভিক্ষা ব্রত অবলম্বন, বন্ধুগণের চরণামৃত পান ইত্যাদি অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সকল ভেক বা ধর্ম্মান্ধতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সকল অনুষ্ঠান ধর্ম্মোপার্জ্জনের কোনই সাহায্য করে না বরং সমাজকে সাম্প্রদায়িকতা ও কুসংস্কারের হস্তে নিক্ষেপ করে। শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাসে টাউন হলে "ব্রাহ্ম সমাজের"

ভবিষ্যৎ” বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে এই সকল কার্য্য দ্বারা সমাজের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট সাধিত হয় নাই। এই সময় হইতেই কেশব বাবু তাঁহার সমাজে শংখ, ঘণ্টা, কাঁসর, ধুপ, ধুনা, পুষ্প ইত্যাদি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। আরতি প্রথাও এই সময়েই তাঁহার সমাজে প্রবর্ত্তিত হয়।

বিধান ঘোষনার কয়েক মাস পরে কেশব বাবু সপরিবারে নাইনিতল পর্ব্বতে গমন করেন। এখানে তিনি সস্ত্রীক ভজন সাধন করিতেন। এই সময়ে তিনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া পত্নীকে পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া একতন্ত্রী লইয়া সাধন করিতেন। কেশব বাবুর পত্নী এই সময়ে যোগ সাধনের জন্য কেশভার মোচন করেন। নাইনিতল হইতে প্রত্যাগত হইয়া কেশব বাবু কয়েক খানি ক্ষুদ্র ইংরাজী পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই সময় হইতে তিনি প্রার্থনায় গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন।

১৮০২ শকের ১৬ই মাঘ কেশব বাবু প্রচারক সভাকে “প্রেরিত দিগের দরবার” নামে অভিহিত করেন। পূর্ব্বে এই সভার এই নিয়ম ছিল যে, ইহার প্রত্যেক প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইবে। যদি কোন সভ্য বিরোধী হন, তাহা হইলে প্রস্তাব স্থগিত থাকিতে পারিবে। কোন

কোন সভ্য বলিয়াছিলেন যে তথায় সভাপতির মত সর্ব্বোপরি প্রবল হইবে। এক্ষণে নিয়ম হইল যে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত সকল সভ্য একমত না হইবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইতে পারিবে না। এই বৎসর উৎসবের সময় বেদ, বাইবেল, কোরাণ ও ললিতবিস্তার একস্থানে স্থাপিত করিয়া তাহার উপর নব-বিধানের নিশান উড়াইয়া দলস্থ লোক দিগকে উহা স্পর্শ করিতে বলেন। অনেকে তদনুসারে স্পর্শ করিয়াছিলেন। যাঁহারা স্পর্শ করিলেন, তাঁহারা বিধান ভুক্ত হইলেন। দরবার স্থাপিত হইল বটে কিন্তু তাহার মতানুসারে কেশব বাবু কোন কার্য্যই করিতেন না। তিনি আদেশের দোহাই দিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেন। অতঃপর কেশব বাবু শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত বাবু গৌর গোবিন্দ রায়, শ্রীযুক্ত বাবু অঘোর নাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্য নাথ সান্যালকে রৌপ্য পদক প্রদান করেন। এই পাঁচজন প্রচারক ও শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ মজুমদার শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র সেনকে প্রেরিত উপাধি দান করেন। শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে প্রচারক পরিবারের প্রতিপালক এবং শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত

বাবু রামচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সেন মহাশয় দিগকে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয়কে মান্দ্রাজে শ্রীযুক্ত বাবু অঘোর নাথ গুপ্ত মহাশয়কে পঞ্জাবে, শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ মজুমদার মহাশয়কে বিহারে, শ্রীযুক্ত বাবু গৌর গোবিন্দ রায় মহাশয়কে উড়িষ্যা ও উত্তর বাঙ্গালায়, শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়দ্বয়কে পূর্ব্ববঙ্গে এবং শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল ও শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত মহাশয়দ্বয়কে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে প্রচারার্থে নিযুক্ত করেন। ইহার কিছুদিন পরে হোম, জলসংস্কার ও মহর্ষি ঈশার রক্ত মাংস ভোজন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। কেশব বাবুর কমল কুটীর ভবনস্থ কমল সরোবর নামক পুষ্করিণীতে তিনি শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হন। অনন্তর পুত্রের প্রতি সংসারের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া গোঁফ ও মস্তক মুণ্ডন ও গৈরিক খেলকা পরিধান করিয়া ভিক্ষার ঝুলী গ্রহণ করেন। এই সময়ে "বিধান ভারত" নামক গ্রন্থ রচিত হয়।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ্চ "নববিধান" নামক ইংরেজী সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন পরিচারিকা বালক বন্ধু, থিয়িষ্টিক কোয়াটার্লী রিভিউ পত্র প্রকাশিত

হয়। ব্রহ্মবিদ্যালয় ও ভিক্টোরিয়া কলেজেও এই সময়ে স্থাপিত হয়। স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য ভিক্টোরিয়া কলেজের সৃষ্টি। কেশব বাবু অনেক অন্যায় কথা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া রবি বাসরীয় মিরার পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮০৩ শকের সাম্বৎসরিক উৎসবের পর কেশব বাবু বহু মূত্ররোগে আক্রান্ত হন। পীড়ার প্রথম আক্রমণেই তিনি মৃত-প্রায় হইয়াছিলেন। কিন্তু সে যাত্রায় পীড়া কথঞ্চিৎ উপশম হইল। শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইবামাত্র তিনি দারজিলিং গমন করিলেন। তথায় তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইল। তিনি তথা হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া নব বৃন্দাবন নাটক অভিনয়ে ব্যাপৃত হইলেন। অভিনয় কার্য্য অতি সুন্দর হইয়াছিল। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ-নিজ বাটীতে নাটক অভিনয় করাইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি পৃথিবীস্থ সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া এক পত্র লেখেন। তাহাতে নব বিধানের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছিল।

নব বিধান প্রচারের পর কেশব বাবু ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-মন্দিরের নাম "টেবার্ণেকেল" রাখেন ও প্রচারকদিগের নামের পূর্ব্বে "শ্রদ্ধেয় ভাই" শব্দ সংযুক্ত করেন।

১৮০৪ শকের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তিনি টাউন হলে, "ইয়োরোপের নিকট এসিয়ার সংবাদ" নামক বক্তৃতা প্রদান করেন। টাউন হলে এই তাঁহার শেষ বক্তৃতা। সেই সুন্দর মূর্ত্তি আর বহু জন-সমাকীর্ণ টাউন হলের সুপ্রশস্ত কক্ষে উপস্থিত হইয়া মধুর বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃ বর্গের কর্ণে আর অমৃত বর্ষণ করিতে পারে নাই। শ্রোতাগণ আর তাঁহার মোহিনী বাগ্মীতায় মুগ্ধ হইয়া সোৎসুক করতালী দ্বারা হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ করিবার অবসর পান নাই।

এই বৎসর উৎসবের সময় কেশব বাবু স্বর্ণ বলয় হস্তে দিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। উৎসবান্তে তিনি সপরিবারে শিমলা শৈলে গমন করেন। পথের কষ্টে অম্বালায় গিয়া পীড়িত হইয়া পড়েন। সিমলায় উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার প্রভাবে কথঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করেন। সিমলাতে "তারা ভিউ" নামক ভবনে তিনি অবস্থান করিতেন। কিছু সুস্থ হইয়া তিনি নব সংহিতা নামক পুস্তক প্রণয়নে নিযুক্ত হন। সকাল হইতে বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত পুস্তক লিখিয়া তাহার পাণ্ডুলিপি (copy) ডাকে পাঠাইয়া পরে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপ অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার পীড়া পুনরায় বৃদ্ধি পাইল।

এই পীড়িত অবস্থাতে আমেরিকার কোন ব্যক্তির

অনুরোধে "যোগ" নামক একটী প্রবন্ধ লিখিয়া তথায় প্রেরণ করেন। এই সময়ে উপাসনার পর আর তিনি বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। শরীর এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িত যে তাঁহাকে শয্যাশায়ী হইতে হইত। অন্য লোকে কোমর ও পিট টিপিয়া দিলে তবে আহার করিতে পারিতেন। এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসকেরা শারীরিক পরিশ্রমের জন্য সুতারের কার্য্য করিতে পরামর্শ দিলেন। কেশব বাবু তদনুসারে আহারান্তে ২।৩ ঘণ্টা সুতারের কার্য করিতেন। কয়েক খানি টেবল ও ছোট ছোট কয়েকটা আলমায়রা তিনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উত্তরোত্তর শরীর দুর্ব্বল হইতে লাগিল দেখিয়া চিকিৎসক গণ দুগ্ধের সহিত ডিম্ব ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন। বলা বাহুল্য যে কেশব বাবুর দ্বারা এই ব্যবস্থা প্রতিপালিত হইয়াছিল। যে দুঃসহ বেদনা তাঁহাকে মৃত্যু পর্য্যন্ত যন্ত্রণা দিয়াছিল, তাহা এই স্থানেই তাঁহাকে আক্রমণ করে। দুইজন বলবান লোক কোমর টিপিয়া ধরিয়াও বেদনার কিছু করিতে পারিত না। ইহার উপর আবার শুষ্ক কাশীতে যার পর নাই যন্ত্রণা দিত। যখনই কাশী তাঁহাকে আক্রমণ করিত, তখনই তিনি উপাসনা সাগরে নিমগ্ন হইতেন। সে অবস্থায় কাশী তাঁহাকে অধিক যন্ত্রণা প্রদান করিতে পারিত না।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি ভগ্ন শরীরে কলিকাতায় প্রত্যাগত হন। পথে দিল্লী ও কাণপুরে কয়েকদিন থাকিয়া হাকিম দ্বারা চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। কিন্তু কোন উপকার হয় নাই। কলিকাতা আসিবার পর এলোপেথি মতে চিকিৎসা চলিতে লাগিল। পথ্য মাংসের যুষ ও ডিম্ব। এ সময়ও তিনি নিষ্কর্ম্মা থাকিতে পারেন নাই। নব সংহিতার প্রুফ সংশোধন বাটী মেরামত ইত্যাদি কার্য্যে, যখনই শরীর সুস্থ থাকিত তখনই তিনি ব্যাপৃত হইতেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার বাড়িতে দৈনন্দিন উপাসনার জন্য একটী মন্দির প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। কেদারায় বসিয়া মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য পারদর্শন করিতেন। অতঃপর পীড়া অত্যন্ত সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল। এই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরম হংসও তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া লর্ড বিশপ তাঁহাকে একদিন দেখিতে আইসেন। সে সময়ে তাঁহার দন্ত মূল হইতে রক্ত নিঃসৃত হইতেছিল। তিনি পিকদানিতে রক্ত ফেলিতে ফেলিতে তাঁহার সহিত আলাপ করেন।

পীড়া দিন দিন ভীষণ হইতে ভীষণতরে পরিণত

হইতে লাগিল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি কেশব বাবু তাঁহার বাটীস্থ অসম্পূর্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাকে কেদারায় বসাইয়া ধরাধরি করিয়া নীচে আনা হয়। বেদীর কার্য্য তিনিই সম্পন্ন করেন। তাঁহার বেদীতে এই শেষ উপবেশন। প্রকাশ্য ভাবে ধর্ম্মবন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া এই তাঁহার শেষ প্রার্থনা।

দেবালয় (বাটীস্থ মন্দির) প্রতিষ্ঠার তিন চারি দিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বেদনার যন্ত্রনায় তাঁহাকে অত্যন্ত কাতর করিয়াছিল। বেদনার যাতনায় তিনি দিন রাত্রি কেবল "মারে, বাবারে," বলিয়া চিৎকার করিতেন। একদিন শ্রীযুক্ত অমৃত লাল বসু মহাশয় শয্যার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন, কেশব বাবু অমৃত বাবুর গলা ধরিয়া তাঁহার ক্রোড়ে মাথা লুকাইয়া বলিলেন ভাই অমৃত, বেদনায় হাড় গুড়া হইয়া গেল। অনন্তর দেবালয়ের মেজেতে কত শ্বেত পাথর লাগিবে; সেই সম্বন্ধে অমৃত বাবুর সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। আর একদিন সঙ্গীত প্রচারকের গলা ধরিয়া বলিলেন, "ভাই, প্রাণের ভাই আমার, তুমি আমাকে অনেক ভাল ভাল গান শুনাইয়াছ। আবার আমি গান শুনিব। স্বর্গে গিয়া আবার গান শুনিব। মা আমাদের জন্য ধ্রুবলোক প্রস্তুত করে রেখেছেন। সেই খানে আমরা সকলে যাব।"

তিনি শয্যা পার্শ্বস্থ জননীর পদধূলি পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিতেন। একদিন জননী তাঁহাকে বেদনায় অস্থির দেখিয়া বলিলেন, "কেশব আমার পাপেই তোমার এত যন্ত্রণা হইতেছে।" তিনি মাতৃবক্ষে মস্তক রাখিয়া বলিলেন, "মা তুমি এমন কথা বলিও না। তুমি আমার ধার্ম্মিক মা। তোমার আশীর্ব্বাদেই আমার সব হইয়াছে, এবং তোমার গর্ভে জন্মিয়াছি বলিয়াই, আমি এত ভাল হইতে পারিয়াছি।"

এই সময়ে সিন্ধু দেশ বাসী নেভাল রাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, কোন ভাল দ্রব্য দেখিলে আনন্দ বাজারের জন্য পাঠাইয়া দিও। ইহার কয়েকদিন পূর্ব্বে অমৃত বাবুকে বলেন যে মন্দিরের পার্শ্বস্থ জমী বিক্রয় করিয়া মন্দিরের ঋণ পরিশোধ করিও। তিনি নিজেও ইহার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পীড়ার আতিশয্য নিবন্ধন কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ক্রমেই তাঁহার অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল। চিকিৎসকগণ হতাশ হইলেন। আত্মীয়গণ তাঁহার বাঁচিবার আশা পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় হোমিওপ্যাথি মতে তাঁহার চিকিৎসা করিতেছিলেন। ৭ই জানুয়ারি তাঁহার বাক্য রোধ হয়। কেশব বাবু পীড়ার যন্ত্রণায় সর্ব্বদা ছট্ ফট্ করিতেন,

কেবল সঙ্গীত করিলে নীরব ও সুস্থির থাকিতেন। অনন্তর শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন সমুপস্থিত হইল। সোমবার তাঁহার বাক্যরোধ হইয়াছিল। মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ন ৯টা ৫৩ মিনিটের সময় তিনি পরিবারগণকে দুস্তর শোক সাগরে ভাসাইয়া, আত্মীয় বন্ধুগণকে অকূল পাথারে নিক্ষেপ করিয়া অমরধামে গমন করিলেন। স্নেহময়ী জননীর গভীর শোকোচ্ছ্বাসে কমল কুটীর উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল। জননীর হৃদয় ভেদী আর্ত্তনাদে—অভাগিনী পত্নীর মর্ম্ম বিদারক ক্রন্দন ধ্বনীতে কমল কুটীর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শোকের সেই বিষাদময়ী মূর্ত্তি যিনি অবলোকন করিয়াছেন, তাঁহার অন্তরে তাহা অঙ্কিত থাকিবে। মৃত ভাষার সাধ্য নাই যে শোকের সেই জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিতে পারে।

অনন্তর কেশব বাবুর রোরুদ্যমানা পত্নী তাঁহার পদ যুগলে পুষ্পাঞ্জলি ও গলে পুষ্পমালা প্রদান করিয়া বলিলেন, "আমি দেবতা স্বামী পাইয়াছিলাম। হায়! চিনিতে পারিলাম না।" অনন্তর অপরাহ্ন ৩টার সময় মৃত দেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার আয়োজন হইল। মৃত দেহকে স্নান করাইয়া গরদের কাপড় পরাইয়া পুষ্পমালা ও ললাট চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া খট্টার উপর শায়িত করা হইল। খট্টও পুষ্পদ্বারা সজ্জিত হইয়াছিল। পরে খট্টা দেবালয়ে

রাখিয়া উপাসনা হইল। অনন্তর মৃত দেহকে লইয়া সকলে শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের শত শত লোক তাঁহার অনুযাত্রী হইয়াছিল। যথা সময়ে মৃত দেহ শ্মশান ভুমিতে নীত হইল। চন্দন কাষ্ঠ দ্বারা চিতা প্রস্তুত হইল। যে সুন্দর কলেবর বিডন উদ্যান, টাউন হল, ব্রহ্ম মন্দির প্রভৃতি শোভিত করিয়া লোক লোচনের আনন্দ বর্দ্ধন করিত, মুহুর্ত্তের মধ্যে তাহা ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়া গেল। সুবর্ণ প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া সকলে ভগ্ন হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। পরে ভস্মাবশিষ্ট চিতাভস্ম কমল কুটীরের সম্মুখভাগে প্রোথিত করিয়া তাহার উপর সমাধি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের জীবনী আমরা এই স্থানেই শেষ করিলাম। তিনি ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় লোক পৃথিবীতে অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার জন্ম গ্রহণে পতিত বাঙ্গালী জাতির গৌরব বাড়িয়াছে। বঙ্গমাতা তাঁহার ন্যায় সন্তান আর লাভ করিতে পারিবেন কিনা, গভীর সন্দেহ। তাঁহার বিশ্ব বিমোহিনী বাগ্মীতা, অসাধারণ প্রতিভা, ঐকান্তিক ঈশ্বর নিষ্ঠা ও উন্নত ধর্ম্ম-জীবন তাঁহাকে চিরকাল অমর করিয়া রাখিবে। যতদিন ইতিহাস বিদ্যমান থাকিবে, মহৎ লোকের সম্মান

থাকিবে, মহাত্মা কেশবচন্দ্র তাবৎ জন সাধারণের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। কিন্তু এ হেন মহাত্মাকে যে আমরা নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা করিতে পারিলাম না, গুণগানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে যে দোষের উল্লেখ করিতে হইল, তজ্জন্য মনে দুঃসহ ক্ষোভের উদয় হইতেছে। হৃদয় গভীর সন্তাপে সন্তপ্ত হইতেছে; কিন্তু নিরুপায়। সংসারের কিছুই দোষশূন্য নহে। নিরবচ্ছিন্ন নির্দ্দোষ পদার্থ সংসারে দুর্ল্লভ। নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং কেশবচন্দ্রতেও দোষ থাকা কিছু বিচিত্র নহে। এই আমাদের প্রবোধ ও সান্ত্বনা।